উত্তরস্যাং দিশি

UTTARASANG-DISHI
Bijan Chakravorty

উত্তরস্যাং দিশি

বিজন চক্রবর্তী

ক্লাসিক প্রেস

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস,
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

মানুষের জীবনে কোন কিছু না ঘটাই একটা দুর্ঘটনা—এই রকম একটা কথা কোথায় যেন পড়েছিলাম। আমার মনে হয় জড়বাদী বস্তু-সর্বস্ব সভ্যতার সর্বোচ্চ চিন্তাধারা এর চেয়ে ভাল করে আর কোথাও প্রকাশ পায় নি। আর, আমার ঘটনাহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হল তাকেও একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় কিনা জানিনা।

পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি উচ্চতা এবং তিরিশ ইঞ্চি বক্ষ নিয়ে কেউ যে কখনও সৈনিক হতে পারে, এ আমার কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল। রিক্রুটিং অফিস-এর সামনের মাঠে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে খালি গায়ে যারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কেউই বাঙালী নয়। ওই আজানুলম্বিতবাহু, প্রশস্ত-বক্ষ, পুরুষশ্রেষ্ঠদের মধ্যে যখন আমাকেও দাঁড়াতে বলা হল, তখন মনে মনে বলেছিলাম, ধরণী দ্বিধা হও! ঘৃণা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের উপর; কারণ এরকম রোমহর্ষক পরিস্থিতি থেকেও সে আমায় পরিত্রাণ করতে পারল না। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করলাম। দৈত্যাকার শিখ রিসালদার সাহেবকে মোলায়েম স্বরে বললাম, আমি তো যাচ্ছি কেরাণীগিরি করতে। আমি তো 'সিপাহী' নই।

ঘন-কৃষ্ণ দাড়ি গোঁফের মধ্যে যেন 'কালোগেট-হাসি' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'দন্তরুচি কৌমুদী'র যথার্থ-অর্থ সেই ক্ষণে উপলব্ধি করলাম। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, জয়দেবের নিশ্চয়ই ছিল দাড়ি আর গোঁফের বাহার। মনে মনে যখন তারিফ করছি তার, তখন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হল—'হুকুম্ মানো।'

দুটি মাত্র শব্দ। কিন্তু তারই আঘাতে জয়দেব মুহূর্তে বাঙালী

বসে গেলেন। চকিতে দেখে নিলাম আমাদের দূরত্ব শঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে কিনা। তারপর নিঃশব্দে সারির শেষে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পরবর্তী ঘটনাগুলো যেন সিনেমার ছবির মতো ঘটে যেতে লাগল। একজন এসে লাল চক্ দিয়ে বুকে নম্বর লিখে গেল। আর একজন এসে লিখে গেল বুকের মাপ, উচ্চতা। আমি ভুলে গেলাম যে আমি একজন মানুষ। মনে হল, রেলের পার্শেল অফিসে যেন মাল বুক হচ্ছে।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'ডগ্‌দরী' 'অপিস ঘর' সব শেষ হয়ে আমি শ্রীমান অমুক, পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হলাম—'Recruited as sepoy and promoted to the rank of···· ·'। 'ডগ্‌দরী'র অধিকর্তা, ডাক্তারী পরীক্ষার অজুহাতে যিনি চরম অসভ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে, সেই দুর্ধর্ষ লেপ্টেনান্ট রে, একগাল হেসে সিগারেট অফার করলেন। আর সেই গর্বে আমার তিরিশ ইঞ্চি বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠল। মাত্র আধ ঘণ্টা পূর্বের অপমানকর পরিস্থিতির ছায়া সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হল আমার মন থেকে।

প্রবাদ আছে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমি বলি—তা নয়। জাতি হিসাবে বাঙালী অত্যন্ত বেশি আত্ম-সচেতন। লেঃ রে-র একটি সিগারেট এক ধাক্কায় আমায় যে স্বর্গে তুলে দিল, তীব্র আত্ম-সচেতনতার জন্যই, আমি সেই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। আমার আপদ্‌কালের সঙ্গীদের মধ্যে যারা সেই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিপাহীর পদ অলঙ্কৃত করল, তাদের দিকে তাকালাম একটু ঘৃণা—একটু করুণামিশ্রিত দৃষ্টিতে। ওই নোংরা, অশিক্ষিত মানুষগুলোর সংগে এতক্ষণ যে পাশাপাশি থাকতে হয়েছে ভেবে শিহরিত হয়ে উঠলাম।

মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির যে মেশিন তৈরী করেছিল ব্রিটিশ সরকার, তার সবচেয়ে বড় স্ক্রু হল এই সৈন্য বিভাগ। 'রাহাদারী সার্টিফিকেট' আর 'বেলওয়ে ওয়ারেন্ট' পকেটে নিয়ে, লেঃ রে-র সঙ্গে করমর্দন করে আর একবার সগর্বে তাকালাম আমার পূর্ব সঙ্গীদের দিকে। আমার জীবনে ঘটে গেল একটা ঘটনা। পরিবেশ হল পরিবর্তিত।

উনিশ শ' একান্ন সালের তিরিশে ডিসেম্বরের প্রভাত, এক নতুনতর পরিবেশ নিয়ে উপস্থিত হল আমার জীবনে। প্রখর রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশকে অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন দেখে, বাতায়ন পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হয়ে গেলাম। সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট, গম্ভীর, ভীষণ পর্বতশ্রেণী। বিপুল বেগে, উদ্ধত স্পর্ধায় সেই দিকে ছুটে চলেছে যন্ত্রদানব। অসীমের উপর সীমারেখা টেনে, কালের পরিব্যাপ্তির উপর সমাপ্তির চিহ্ন দিয়ে, মানুষের চিন্তাশক্তিকে সহসা কেউ যেন আবদ্ধ করে দিল পূর্ণচ্ছেদের সম্পূর্ণ রহস্যের মধ্যে। উত্তাপের আধিক্যে অমৃতসরে যে গরম কাপড়গুলো ত্যাগ করেছিলাম অবহেলায়, তাদের আবার সস্নেহে স্মরণ করলাম। পাঠানকোটে লৌহদানবের যাত্রা শেষ হল। 'কাশ্মীর-মেল' নিজেকে উজার করে আমাদের বিলিয়ে দিল প্রকৃতির কোলে—সহস্র বাহু মেলে আলিঙ্গন করল হিমালয়।

বস্তুর প্রাণশক্তিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা রাখি না আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে। সারা রাত্রির সাহচর্যে আমার 'আমিত্ব' এবং 'কাশ্মীর-মেল'-এর 'আমি'ত্ব এক হয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল এক বৃহত্তর 'আমি'র। ওয়েলস-এর ভাষায় 'absolute oneness' এর।

সেই 'আমি'র যাত্রা শেষ হল, কিন্তু আমার যাত্রার শেষ হল না। এ যেন—'In my beginning is my end, in my end is my beginning',—অসীম অসম্পূর্ণত্ব থেকে, অসীম সম্পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে চলা। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—জন্ম থেকে জন্মান্তর। আমার মনে হল, এ চলার যেন বিরাম নেই।

সৈনিকের পোষাকে শরীর ঢেকে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় এ দার্শনিক চিন্তা যতই অবাস্তব মনে হোক, আমার মন কিন্তু সত্যই দার্শনিক হয়ে উঠেছিল। কাম্পতি-র ট্রেনিং সেণ্টার থেকে, যে-দিন ওরা আমাকে মানুষ মারবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছি ভেবে, হাতে 'মুভমেণ্ট অর্ডার' গুঁজে দিল, সেদিন 'পাঠানকোট' শব্দটা দেখে চমকে উঠেছিলাম। বাঙালীর কাছে পাঠান শব্দটাই কেমন যেন ভীতিপ্রদ। কর্ণপটাহে যেন গাঁক্-গাঁক্ শব্দ করে ওঠে। ওই শব্দের দাপটেই লক্ষ্মণ সেন একদিন খিড়কির পথ ধরেছিলেন—এ তথ্য ইতিহাস পড়ে জেনেছি। পাঠান শব্দটি এতদিন আমার কাছে ছিল ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ। মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত যে-দিন সেই পাঠানের 'কোট' অর্থাৎ আস্তানায় যাবার আদেশ পেলাম, সেদিন অনেক চিন্তা করেও পালাবার পথ পাই নি। কারণ এটা পঞ্চদশ শতাব্দী নয়। ভারতের যেখানেই থাকি না কেন, 'ডেজার্টার' ঘোষণা করে হাতে বালা দিয়ে টেনে আনবে আমায়। আর, দার্শনিক চিন্তার মস্তবড় সুবিধা এই যে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অবহেলাভরে এড়িয়ে যাওয়া যায়। পাঠান-কোটের ভয়াবহতা এড়াবার জন্যই আমার বাঙালী মন এই দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছিল।

যাত্রীরা সব যে যার পথে চলে গেল। নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পাঠানকোটের প্লাটফর্ম। আমার নির্লিপ্ত, নির্বিকার দার্শনিক তুরীয়ভাব দেখে, আমার অনুচর সবিনয়ে জানাল যে, খাওয়ার মত বীভৎস এবং অপ্রয়োজনীয় কার্যটি

এখনও সমাধা করা হয় নি। অতএব 'সাব্' যদি মেহেরবানি করে সে বিষয়ে সচেষ্ট হন, তবে সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবে। অনুচরটি জাতে নাপিত ; 'Non combatant enrolled'। স্বীকার করলাম, কাশ্মীরের লড়াই ফতে করবার জন্য কয়েক হাজার নরসুন্দর পাঠালেই চলে—combatant এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু নির্জন নির্বান্ধব প্লাটফর্মে এমন একটি লোক পেলাম না, যে আমাকে পথ দেখাবে এরপর।

সৈনিক হিসাবে আমি শিশু : মাত্র দু মাসের। আমার মতো একটি নাবালক অপদার্থ বাঙালীকে কাশ্মীর-ফ্রণ্টে পাঠানর জন্য কর্তৃপক্ষকে এতটুকুও প্রশংসা করতে পারলাম না মনে মনে। অসহায়ভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যখন তামাম দুনিয়াটাকে অভিশাপ দিচ্ছি, নরসুন্দর তখন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিল, বাইরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। 'সাব' এখন দয়া করে এই পথটুকু হেঁটে গেলেই, সব ফয়সালা হয়ে যায়।

সৈনিকের পান্থনিবাস হল 'ট্রান্‌জিট্ ক্যাম্প্', সেখানে আর যাই হোক, পথের তার শেষ হয় না। শেষ হয়না শ্রান্তির। তাই পাঠান-কোট ক্যাম্পে এসে আরও অসহায় হয়ে পড়লাম। প্লাটফর্মে আমার অসহায়তার দর্শক আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখানে রাস্তার উপর বিছানা আর সুটকেশ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অজস্র দর্শক বিস্ফারিত নেত্রে আমার অবস্থা উপভোগ করতে লাগল। আবাসস্থল আর আহারের অন্বেষণে আমি যখন মুমূর্ষু তখন মনে পড়ল লালসাহেবের কথা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে। কাম্পতির সেই সন্ধ্যাটির কথাও মনে পড়ল, যখন এই রকমই একটা দুরবস্থার মধ্য থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন লালমহেন্দ্র সিং।

আগ্রার লালমহেন্দ্র সিং সৈন্য বিভাগে এসেছিলেন তাঁর 'মাশুকা'র প্রতি 'ইন্তকাম্' নেবার জন্য। ছ' ফুট এক ইঞ্চি দীর্ঘ

বিশালকায় লালসাহেব যেদিন এ কাহিনী বলেছিলেন, সেদিন কিন্তু তাঁর দুঃখে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখবোধ হয়নি। বরং হাসি পেয়েছিল এই দীর্ঘ-দেহীব মস্তিস্কের স্বল্পতাব পরিচয় পেয়ে। তাঁর 'হুর-এ-জন্নত', 'নূর-এ-জঁহা' বাল্যসখী সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী মিস প্রেমা, যেদিন তাঁব হৃদয় নিংড়ান প্রেম উপেক্ষা করল শুধু এই কাবণে, যে লালসাহেবেব প্রেম পুরুষোচিত দৃপ্ততায় দুদান্ত ছিল না, সে-দিন লালসাহেব নিজেব কলিজা উপড়ে ফেলে তার 'বুলবুল্'কে মেরেছিলেন এক চড়, নিজেব পৌরুষ প্রদর্শনের জন্য। তারপর তাঁর 'মাশুকা'—প্রেমিকাব প্রতি, 'ইন্তকাম্' অর্থাৎ প্রতিহিংসা নেবার জন্য সৈন্য বিভাগে ভর্তি হলেন। এ হ'ল খাস পশ্চিমী প্রেম। এখানে হৃদয়েব সঙ্গে দেহেবও কদর বুঝতে হবে। শুধু হৃদয়ই চাই না—চাই রক্তমাংসের শবীরও: চাই 'বেণীর সঙ্গে মাথা'। আমি হলে যেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে বিবাট এক মহাকাব্য লিখে ফেলতাম অথবা নিরুদ্দেশ যাত্রা করতাম, লাল সাহেব সেখানে চবম বস্তুবাদের নিদর্শন পেশ করলেন। তারপর তাঁব সুপুষ্ট গুম্ফে হাত বুলিয়ে গুনগুনিয়ে উঠলেন, 'কাস্ মায় লয়লা কে গলেকা হাব হো জাতা'।

লালসাহেব ছিলেন পরোপকারী। কিন্তু আমি বুদ্ধিজীবি বাঙালী। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন, শত অনুরোধেও, কারও কোন উপকার করবাব কথা আমি সন্দেহহীন দৃষ্টিতে দেখতে পারি না। তাই লালসাহেবকে আমি এত সরলভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। মিস প্রেমার প্রতি তাঁব 'সচ্চী মুহব্বত'-এর যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে আমার প্রতি তাঁর 'দোস্তী'ব গভীরতা সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল—আমাকে তাঁর 'জীগরী দোস্ত' বলে জাহির করা সত্ত্বেও। বিপদে যে পাশে দাঁড়ায়, সে যদি বন্ধু হয়, তবে লালসাহেব নিশ্চয় পড়েন সে গোষ্ঠীতে, একথা অস্বীকার করি না।

তাই, এই লালসাহেবকেই স্মরণ করলাম, কারণ আমি স্বার্থপর।

নতুবা মনে পড়ল না কেন কাম্পতির মত্র সহকর্মীদের কথা, যারা সেখানে আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেছিল সেদিন, অবজ্ঞা আর অবহেলার দৃষ্টি দিয়ে।

উদ্ধার করলেন সোহল্—অতি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করব একথা। সোহল্ আর লালসাহেব পাশাপাশি দেশের লোক। বিপদগ্রস্ত বাঙালী তাদের কাছে উপেক্ষার পাত্র নয়, সহৃদয় সাহায্যের পাত্র। তবে লালসাহেবের সংগে এঁর পার্থক্য প্রচুর; জমাদার সোহল ছিলেন সৈনিক হয়েও শিক্ষিত পরিমার্জিত আর সমুদার।

ক্যাম্পের অগনন মানব-সমুদ্রের কলকল্লোল থেকে উদ্ধার করে প্রথমেই তিনি আমায় নিয়ে এলেন মেস্-এ। সস্নেহ-অনুভূতির প্রভাবে তিনি বুঝেছিলেন আমার প্রথম প্রয়োজন হল খাদ্যের। খাবার সামনে রেখে গল্প করবার মতো অবস্থা আমার তখন নয়। তাই, একতরফা সোহলই চালালেন তাঁর অপূর্ব বাক্য-স্রোত। কাঁটা-চামচের দ্রুত ওঠা-নামার ফাঁকে ফাঁকে পরিচয় পেলাম তাঁর হৃদয়ের গভীরতার। নিতান্ত নিরস ব্যক্তিকেও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে তার কুশলী মনের স্পর্শ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। এ ধরণের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে মনে হয় না যে বসে আছি মেস্ অথবা বার-এ, আর অতি যত্নে রক্ষা করে চলেছি এটিকেট্। মনে হয় অতিপরিচিত, শান্ত পারিবারিক আবহাওয়ায় চলেছে ভোজন-পর্ব, যেখানে এটিকেট্-এর চেয়ে পরিস্ফুট আন্তরিকতা, ভদ্রতার চেয়ে লক্ষণীয় আত্মীয়তা।

কিন্তু তবুও যে তাঁর সংগে আমার দ্রুত পরিবর্ধমান বন্ধুত্ব-সূত্র অচিরেই ছিন্ন হয়েছিল, তার একমাত্র কারণ হল তিনি অবাঙালী হয়েও পলিটিকস্ আলোচনা করতেন। আমার বিশ্বাস, রাজনীতি—বাঙালীর জন্মগত অধিকার, তার প্রকাশ হোক না কেন সাঙ্গুভ্যালীতে অথবা রকে, অফিসে অথবা ক্লাবে। নাগরিক

পরিবেশে যে-কথায়, নিতান্ত ক্ষীণজীবি আমি বাঙালীও হয়তো সোহলের মতো শিখকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতাম, তা কিন্তু বেবাক হজম করলাম জঙ্গী পরিবেশে। সোহল বলেছিলেন—নেতাজী দেশদ্রোহী। আর আমি আমার কর্তব্য সমাপন করলাম এই বলে যে, হতভাগ্যের রাজনীতি-জ্ঞান কতই স্বল্প। তাও বলেছিলাম নেপথ্যে।

পেশাওয়র-এর জওয়াহর খান্না কিন্তু বলেছিল অন্য কথা। আমার কাছে পেশাওয়ব মানেই পাঠান। সে পাঠান যে আবাব হিন্দুও হয়, তা জানতাম না। ট্রেনিং সেণ্টারে পরিচয় হবাব দিন সাতেক পরই তার পোষ্টিং হল। বিহার আর উত্তর প্রদেশের জন কয় মিলে সে সন্ধ্যায় যখন নরক গুলজার করে তুলেছি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাস নিয়ে, পাঠানী চালে খান্না এসে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখে ব্যক্ত করল তাব অমূল্য মতামত। তামাম্ বাঙাল মুলুকটাই অওরত্—মেয়েমানুষের আড্ডা। তাব মধ্যে একজন শুধ্ মর্দ্ জন্মেছিল কি জানি কি ভাবে—সে হল শের-এ-দিল্, নেতাজী সুভাষ।

শতাব্দীর দশকে দশকে কাশ্মীর বিচারের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীব শৈশবে, কাশ্মীর আমাদের কাছে ছিল অপরিচিতা বিদেশিনী। ভ্রমণকারীদের মারফত আমরা খবর পেতাম, সে বিদেশিনী হল উবশী—মেনকা—রম্ভা জাতীয়া। সে ভূস্বর্গে সর্বদা বিরাজ করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। সেখানে প্রকৃতিব অকৃপণ দান সভ্য জগতকে উপহাব দিয়েছে এক অপূব লীলা নিকেতন। ব্রিটিশ সরকার কাশ্মীর নিয়ে যে রাজনীতির খেলা করছিলেন, তার সংস্পর্শ

থেকে আমাদের শিশুর মতো সযত্নে দূরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের এক প্রভাতে কাশ্মীর চমক দিয়ে গেল খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বোল্ডটাইপে। পাকিস্তান হানাদারী বাহিনীর দৌলতে কাশ্মীর তার বোরখা সরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জটিল রাজনৈতিক সমস্যার রূপ নিয়ে। সে দিন আমরা সাবালক হয়েছি। কিন্তু রূপসী স্বর্গবাসিনীর মোহাঞ্জন আমাদের সাবালক নয়নে লাগবার আগেই আমরা শিহরিত হয়ে উঠলাম। সেইদিন আমরা প্রথম জানলাম কাশ্মীরেও রাজনীতি আছে, সেখানেও আছে হানাহানি। তারপর কাশ্মীর সম্বন্ধে যে সমস্ত খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে তার স্বর্গীয়তা গেল ঘুচে। জানলাম মধ্যযুগীয় সামন্ত-তন্ত্র এই সেদিনও হিমালয়ের বুকে কী বীভৎসভাবে গেঁথে বসেছিল। জানলাম, বারামূলা, রাজৌরী, পুঞ্চ আর নৌসেরার হত্যাকাণ্ড এবং অত্যাচার স্তালীনগ্রাদ্ থেকে কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, তখনও আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি।

সেই কাশ্মীরের প্রবেশপথ পাঠানকোট।

পাঠানকোটের ভৌগোলিক সীমানা পাঞ্জাবের মধ্যে হলেও তাকে আমি কিন্তু মেনে নিতে পারি নি পাঞ্জাব বলে, যেমন একে কাশ্মীর বলেও ভাবি নি কোন দিন। হতে পারে পাঠানকোট সম্বন্ধে আমার পূর্বতন ভয়ই এর কারণ। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছে পাঠানকোট হল 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'—রাজনৈতিক এবং রোমান্টিক, উভয় দৃষ্টি থেকেই।

অবিভক্ত ভারতে কাশ্মীরের প্রবেশপথ ছিল চারটি,—রাওলপিণ্ডি—মুরী—শ্রীনগর, শিয়ালকোট—জম্মু—শ্রীনগর, হাভেলীয়ান এবোটাবাদ—শ্রীনগর এবং পাঠানকোট—জম্মু—শ্রীনগর রাজপথ। পাকিস্তান ছিনিয়ে নিল প্রথমোক্ত তিনটি। শেষোক্ত পথটিতে

রেলপথের শেষ হল পাঠানকোটে। তারপর একচ্ছত্র আধিপত্য মোটরের।

পাঠানকোটের সবই বিচিত্র। তার পৃষ্ঠদেশে বেখাপ্পা কুঁজের মতো কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় অদূরের বিরাট হিমালয়ের পাশে কেমন যেন হাস্যকর মনে হয়। বেসরকারী জীর্ণ-বিবর্ণ ট্রাক্ আর বাস্ থেকে নিয়ে, কাশ্মীর সরকারের টুরীস্ট সার্ভিস্-এর বিচিত্র-বর্ণ বাস্গুলো যখন উন্মত্ত চীৎকারে সর্পিল গতিতে ওই সব পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে যাবে, তখন ত্রস্ত পদক্ষেপে জীবন রক্ষা করতে গিয়েই হয়তো সামনে পড়বে ভীষণ-দর্শন মিলিটারী ট্রাক্। তার পাশে উটের সারির মন্থর গতি আর বোরখা, মনে করিয়ে দেবে বোখারা আর সমরখন্দের কথা। বিস্মিত করবে ব্যবসায়ীদের পাঠানী চাল-চলন আর পথচারীদের কাশ্মীরী আলস্য। নিশ্চিন্ত মনে, নির্বিকার ভাবে তারা পথ চলছে চোখ বুঁজে। মেওয়ার দোকানের অজস্র মক্ষিকা, শঙ্কিত করবে আমাদের ডাক্তার-মনকে। পিপাসু মনকে চঞ্চল করবে কোন একটি সচকিত সুন্দরীর বিহ্বল চোখদুটি, বোরখা যার সরে গেছে অন্যমনস্কতায়।

এই মধ্যযুগীয় নগরেও আছে এই শতাব্দীর সর্বাধুনিক অবদান—একটি সিনেমা হাউস। তার ফার্স্ট-ক্লাসের কাঠের আসনে, ঠোঁটে তীব্র লিপস্টিক্, আর গালে গাঢ় রুজ-মাখা আধুনিক মহিলার দর্শন পাওয়াও অসম্ভব নয়। প্রাচীন এবং আধুনিক, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, ভারত আর পাকিস্তান, সব যেন মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে পাঠানকোটে। পাঠানকোট তাই হল একটি প্রকৃত সীমান্ত। তাই আমার মনে হয়েছিল পাঠানকোট একটি 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড।'

আমি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক নই; নই কোন ভূগোল অথবা ইতিহাস লেখক। তাই পাঠানকোটের চৌহদ্দি আমার কাছে পাঠানকোট মুকেরিয়াঁ রেলপথ, আর মাধোপুর ব্রীজ নয়। ইতিহাস

নয় পুরণো জরাজীর্ণ দুর্গটি যার মধ্যে অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করে পাঠানকোটের শান্তিরক্ষকেরা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। আমি দেখে-ছিলাম বিকেলের পড়ন্ত রোদে এর অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময় পথ আর গলি। দুপুরের অলস হাওয়ায় যখন বাড়ী-বাড়ীর ছোট-ছোট জানালাগুলো বন্ধ হয়ে যেত, আকাশের মধ্যে যখন মিলিয়ে যেত চিলদের কালো কালো বিন্দুগুলো, আমার মন তখন উধাও হয়ে যেত পাঠানকোটের ভিতরে, তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, আরব্য-উপন্যাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়াতো। বাজারের মধ্যে পাথরের পথে নাগরার শব্দ তুলে সওদাগরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দোকানে দোকানে, পাগড়িতে তাদের গাঢ় রংয়ের জৌলুষ, দাড়িতে মেহ্‌দীর প্রলেপ। সেই সময় হয়তো কোন তরুণী তার ঘরের ছোট জানালাটা খুলে চেয়ে আছে দূর আকাশের দিকে। তার সুর্মা টানা চোখের মণিতে কিসের যেন ছায়া। বিষাদমাখা মুখখানিতে বন্দীত্বের ব্যথা।

আমার ভাললেগেছিল ওরিয়েন্টাল নগরী এই পাঠানকোটকে।

প্রকৃত 'ফিল্ড-লাইফ' আরম্ভ হল এখানেই। তখন শীতকাল, কিন্তু অক্লান্ত বর্ষণের মধ্যে পূর্ব ভারতীয় শীত ঋতুর কোনও ছোঁয়াচই পাওয়া গেল না। একত্রিশে ডিসেম্বরের এমনই এক ক্রন্দনরত প্রভাতে শিবিরের বাতায়ন পথে, তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের দিকে চেয়ে নানা চিন্তার আনাগোনা মনের মধ্যে অনুভব করছিলাম। নিশ্ছিদ্র ঘন-কালো মেঘে ভরা আকাশ। সেই কুয়াশার ভার যেন আমার মনের উপর চেপে বসেছিল। হিমশীতল বাতাসের প্রচণ্ডতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাঁবুর সারা শরীর।

আমাকে যেতে হবে আরও তিনশ' মাইল উত্তরে কাশ্মীরের এক সুদূরতম আর সুন্দরতম স্থানে—বারামূলায়। সোহলের কাছে বারামূলা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনে মন অস্থির হয়ে ছিল; এবং সেখানেই যেতে হবে জেনে আমার নিদ্রাহীন রাতগুলো ভীষণ

দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে লাগল। সেইদিন প্রথম মনে হল, বাল্যসহচরী তমিস্রার অনুরোধ উপেক্ষা করে হয়তো ভুল করেছি।

বর্তমান জীবন সম্বন্ধে আমার কোনও পূর্বধারণা ছিল না, ছিল না কোন শহীদোচিত দেশসেবার প্রেরণা।

কাশ্মীর ভূমি শত্রুমুক্ত হোক, এ প্রার্থনা করেছি বহুবার। কিন্তু সেই মহৎ কার্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবার কোনও উৎসাহ সজ্ঞানে অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে, হৃদয়-বৃত্তির ক্ষেত্রে আমাতে আর লালমহেন্দ্র সিং-এতে কোনও পার্থক্যই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মন বার বার একথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছিল। কিন্তু প্রেমা আর তমিস্রার মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক। লালসাহেবের পুরুষোচিত আবেগের অভাবে প্রেমা তাকে বলেছিল ভীরু, আর আমার প্রেমের পার্থিব বাস্তবতার জন্য আমার বাল্যসহচরী তমিস্রা আমাকে বলেছিল ক্রূট্। লালসাহেবের পৌরুষের অভিমান, এবং আমার সভ্যতার অভিমান—দুই ভিন্নমুখী স্রোতকে টেনে আনল একই জায়গায়।

প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল নিজের উপর। তমিস্রার জন্য আমার হৃদয়ে যে দুর্বলতা দৃঢ় বিশ্বাসের শিকড় গেড়ে বসেছিল, তা' মুহূর্তে উৎপাটিত হয়েছিল। তমিস্রা শেষ কথা বলেছিল, 'প্রেম কী, তা যেদিন প্রকৃতই বুঝতে পারবে, সেদিন আবার এসো আমার সামনে।'

পরবর্তী জীবনে আর এক মহীয়সী তরুণী যিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমাদের মিলন ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ শুধুমাত্র তাঁর প্রসাধন সামগ্রী সরবরাহের সামর্থ্যই আমার স্বল্প-আয়ের নেই, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমায় দান করেছিলেন পরমজ্ঞান। তমিস্রার মত প্রতারিত করেন নি। তিনি আমার কাছে করেছিলেন 'Revealation of Truth.'

আমার আয়ত্তে কি ছিল আর কি ছিল না, সে হিসাব করে লাভ নেই; প্রয়োজন নেই চিন্তা করবার—আমাব চাব দিকে ছিল কোন্ অমূল্য পুষ্পরাজি, ত্যাগ করে এসেছি কোন্ পারিজাত সৌরভ। আমি শুধু এইটুকু জেনেছিলাম, যে এ হল সেই স্থান যেখানে—

'Beauty cannot keep her lustrous eyes,

Or, new love pine at them beyond to-morrow'.

কিন্তু দ্বিধা থেকে গিয়েছিল, কারণ সেই তমিস্রাই ট্রেন ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে বলেছিল—'মিলিটারী চাকরীটা কি কোন রকমেই ছাড়া যায় না ?'

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমার অপমানাহত মন অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, আমি এ চাকরী ছাড়লে তার কি লাভ।

পরে ভেবে দেখেছিলাম, এই তমিস্রা প্রিয়া নয়—শুভাকাঙ্ক্ষা। আমার আর্থিক আর শারীরিক লাভ ক্ষতির দিকে চেয়েই নির্লিপ্ত ভাবে সে বলেছিল কথাগুলো। যেমন বলত আমার যে কোনও পরিচিত জন। তাই আমি বুঝেছিলাম, আমি এসেছি আর্থিক লাভের হিসাব কষে। 'রাভী'র সেতু, মাধোপুর ব্রীজ পার হলেই আমার বেতনের অঙ্ক স্ফীত হয়ে উঠবে সেই আশায়।

কিন্তু একথাও ঠিক যে আমার অন্তর তিক্ত, বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কীট্স্-এর মতো, আমারও অন্তরাত্মা চীৎকার করে উঠেছিল—'Away ! Away !'—সমস্ত ত্যাগ করে, সব আকর্ষণ পিছনে ফেলে চলে যাও দূরে, আরও দূরে। শুনেছিলাম, প্রকৃতির গোপনতম কক্ষ কাশ্মীরে নেই কলুষতা, নেই গ্লানি, সেই অর্থের হিসাব।

কিন্তু জানতাম না, অপার্থিব অবস্থার মধ্যেও আছে পার্থিব নিয়ম। স্বর্গেরই অপর অংশে আছে নরক। পার্থক্য যদি

কিছু থাকে, তবে সে শুধু একটা প্রাচীরের। সে প্রাচীর হল মন।

একটা প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় তাঁবু কাত হয়ে পড়ল। চমকে উঠলাম। কোথায় দিল্লী আর কোথায় তমিস্রা! আমি বসে আছি পাঠানকোট ক্যাম্পে। বাইরে চলছে ঝড় আর বৃষ্টির তাণ্ডব।

সোহল বললেন, কি ভাবছেন এতো? ফিলিং ডেলিকেট্? আসুন, লেট্স্ হ্যাভ সাম্ ড্রিঙ্ক্। এ ঠাণ্ডায় জমবে ভাল।

ট্রাঙ্ক খুলে সোহল বার করলেন বোতল আর গ্লাস।

জমাদার জৈন বলেছিলেন, যাবে যাও, কিন্তু যা পথ। পদে পদে গাড়ী 'স্লিপ্' করতে পারে। চার দিকে শুধু বরফ আর রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা। প্রাণ খোয়াবার মত এমন স্থান আর পাবে না। তবে এ-সব থেকে যদি কোনও রকমে বেঁচে যেতে পারো, তবে শুধু 'বাহার হী বাহার হ্যায়'।

পরদিন ভোরের কন্‌ভয়-এ যাত্রা করবার সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আবার বললেন সেই কথা, যা কাল মেস্ ভর্তি লোকের মধ্যে তাঁর বলতে বাধো বাধো ঠেকেছিল। বললেন, 'হ্যাঁ, একটা কথা কাল বলতে পারি নি। ওখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লেও……' অসমাপ্ত বাক্যকে একটা অব্যর্থ ইঙ্গিত দিয়ে আরও বীভৎসভাবে প্রকাশ করে দিলেন জৈন। অকস্মাৎ নিদ্রা-ভঙ্গ জনিত বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই জমাদার সাহেব নিলেন বিদায়।

সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠল। ঘৃণায়? না জৈন-চিত্রিত লোভনীয় বস্তুর কল্পনায়?

ঘুম আর এল না। চিন্তা করতে লাগলাম, কি চায় মানুষ?

বেঁচে থাকে কিসের আশায়? দর্শন-শাস্ত্রের শেষ যদি হয় ভগবদ্ লাভে অথবা নির্বাণ প্রাপ্তিতে, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই কি ভুল? আর, যদি সত্য হয় 'প্রলিতারিয়া' মতবাদ, তবে জৈনেব দলই কি পেয়েছেন সত্যের সন্ধান?

দর্শনের চক্রে যেতে চাই না। বিচার করতে চাই না কোনটা সত্য আর মিথ্যা কোনটা। তবে জৈন-বিচিত্রিত বস্তুর জন্য যদি কোন 'কিউ' হয়, তবে আমি হব সে-সারির সবশেষ জন, যে সম্মুখে উপস্থিত হবার পূর্বেই 'স্টক্' হবে শেষ। রিক্ত হস্তে শূন্য পাত্রে ফিরে গেলেও, যাবো এক লঘু মন নিয়ে। সাহস নিয়ে যাবো সঙ্গীদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তাদের সঙ্গে যোগ দিই নি বলে।

বেলা দশটা নাগাদ সোহল সাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলেন, প্রচুর বরফ পড়ে শ্রীনগরের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তিনি ফিরে যাচ্ছেন আবার তু'মাসের ছুটিতে।

এমন একটা সুখবরেও কিন্তু আমি এতটুকু আনন্দবোধ করলাম না। অজানার এক অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি আছে; বিশেষ করে এই বরফে ঢাকা হিমালয়ের। প্রতিদিন সে যেন একটু একটু করে আমাকে সম্মোহিত করে ফেলছিল। তাই পাঠানকোট ছেড়ে এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যাবার জন্য আমার মন ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠছিল। 'বানিহাল্ পাস্' বন্ধ হবার খবর শুনে চমকে উঠলাম।

ছুটিতে যাবার আনন্দে তার্কিক সোহল সাহেব তর্ক ভুলে গেলেন। অনর্গল বলে যেতে লাগলেন তার স্ত্রী আর ছোট ছেলেটির কথা। ছেলেটিকে দেখে এসেছিলেন সবে হাঁটতে শিখেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই সারা বাড়ী ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

এসব খবরে আমার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। আমার অনাসক্তি আর বিরক্তি যখন তিনি বুঝতে পারলেন, আমার ধৈর্য তখন শেষ সীমায়। তীক্ষ্ণধী সোহল অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, কি হল? আপনি খুশী হন নি মনে হচ্ছে?

তিক্ত-স্বরে বললাম, একই ঘটনায় সকলেই যে খুশী হবে তাই বা আপনি কি করে ভাবলেন ?

কেন নয় ?—দৃশ্যতই আশ্চর্য হয়ে গেলেন সোহল, আপনি ছুটিতে যেতে চান না ?

বন্ধুকে দারুণ বিস্ময়ে মগ্ন করে উত্তর দিলাম, আমি যেতে চাই হিমালয়ের শেষ সীমায়, এবং এই শীতেই।

হতবাক বন্ধুর বাক্য-স্রোত দুর্নিবার বেগে আরম্ভ হবার পূর্বেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

সোহলকে দোষ দিই না। খৃষ্ট-ধর্মযাজকদের মতো অনুকম্পা মিশ্রিত করুণ-কণ্ঠে বলতে চাই না—ভগবান এদের ক্ষমা করো। প্রিয়জনের সংস্পর্শ ছেড়ে বহুদূরে বাস করে বছরের শেষে যারা দুমাসের ছুটি পায়, তারা আর যাই করুক, নিস্পৃহ ভ্রূকুটি দিয়ে জগৎকে 'কা তব কান্তা' বলে উপেক্ষা করলে আমি তাদের বাহবা দিতে পারব না। কিন্তু সকলেই তো সোহল নয়।

রহস্য আর বিস্ময়ে ভরা এই ব্রহ্মাণ্ড। একই কারণে একজন হয় গৃহত্যাগী, আর একজন ধায় গৃহপানে। একই আকর্ষণ একজনকে টানে কেন্দ্রের দিকে আর একজনকে ছড়িয়ে দেয় মহাবিশ্বে। এই দুই প্রান্তিকের মিলনের দিনটির অপেক্ষায় আজও মানুষ বেঁচে আছে। তাই আজও রচিত হয় কবিতা ও সাহিত্য। তাই মানুষ এখনও অশান্ত। তাই মানুষ আজও ভালবাসে।

সোহল ভালবাসা মানেন, এবং শুধু এই কথাই মানেন যে ভালবাসার ক্ষেত্রে 'ফার্স্ট' পার্টি' হল পুরুষ। তাঁর মতে সার্থক ভালবাসা হল একটি 'ভ্যালিড্ কনট্রাক্ট্', যেখানে দুই পার্টির 'এগ্রিমেন্ট' আছে, আর আছে 'রিমুনারেশান্'। সোজা ভাষায় লেন-দেন। এই কনট্রাক্ট যাদের জীবনে 'ভ্যালিড্' হয়েছে, মানব-সমাজের মধ্যে তারা হল সার্থক। তাদের জীবন হয়েছে শান্ত, আবেগ হয়েছে স্থির। কবিতা অথবা সাহিত্য নিয়ে এরা আলস্যে

সময় কাটায় না। এরা জীবনটাকে 'রিম্যুনারেশান্'-এর সুদে ভোগ করে চেখে চেখে, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে। পৃথিবীতে এদের দল ভারী।

কিন্তু আরও দুটি উপ-সার্থক দল আছে, সোহল বলেছিলেন, যারা শুধু অশান্তের মতো ভালবেসে যায়, ভোগের চিন্তা করে না। তীব্র, প্রচণ্ড অসহ্য তাদের ভালবাসা। সোহলের হয়তো কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই একটু থেমেছিলেন। আর সেই অবসরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—

"......ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন।"

তারপর পদ দুটির অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উৎসাহে সোহল বলে উঠেছিলেন, সাবাস্! আর যেখানে তাকে মুখোমুখি পায় না, সেখানে তারা বলে—

"Take back the hope you gave—I claim
Only the memory of the same."

এ হল 'সাক্সেস্ফুল রিট্রিট'—সাফল্যের সাথে পশ্চাদপসরণ। এরা ভীরু, জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে এরা ভয় পায়।

এ সব ছাড়া আর একদল অপদার্থ আছে, যাদের জীবনের নেশা হল ভালবাসা। শুধু ভালবাসবার জন্যই তারা ভালবাসে। পরিবর্তে কিছুই চায় না। এরা প্রতিবারের পরাজয়ের পর হা-হুতাশ করে কাঁদে, আর বলে—

"লৌট্ লৌট্‌কে আতা হুঁ মৈঁ,
জা জা কে মঞ্জিল কে করীব্।"

বারবার তোমার 'মঞ্জিল'-এর দ্বারে যেয়ে আমি ফিরে ফিরে আসছি। ভিতরে যেতে চাইলে হয়তো যেতে পারি, কিন্তু তা চাই না। কারণ, তা' হলেই তো সব শেষ। সব গতি হবে স্তব্ধ। এর চেয়ে আমি এই প্রার্থনাই করি, যেন তোমার প্রেম থেকে নিজেকে

স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করে, বারবার আমাকে জন্ম নিতে হয় এই পৃথিবীতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এরা 'ইডিয়টস্'।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখি সোহল সাহেবের 'চারপাই' নিঃসঙ্গভাবে প্রতীক্ষা কবছে অন্য আগন্তুকের। আমার বিছানায় রাখা একটুকরো কাগজে সোহল কাব্য রচনা করেছেন—'ফির মিলেঙ্গে'।

সোহল চলে গেলেন। ভদ্রলোকের সান্নিধ্য ইদানীং অসহ্য হয়ে উঠলেও অনুভব করলাম, এই বিশাল নির্বান্ধব দেশে আমি সঙ্গীহীন। কলকাতার রাজপথের অগনিত জনসমাগম যেমন ব্যক্তিকে সমষ্টির আড়াল কবে রাখে, এখানেও ক্যাম্পের অসংখ্য মানুষ আমাকে আড়াল কবে রাখল সকলের কাছ থেকে। তাব উপব ছিল দিগন্ত পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি। ক্রমে সে যেন আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল।

সেদিন সকালে মেস্-এব টেবিলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলাম একখানা চিঠি, ক্যাম্পেব ঠিকানায় লেখা। আশ্চর্য হয়ে বারবাব দেখলাম ঠিকানা। আমারই যে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনেক চিন্তা করেও ভেবে পেলাম না এমন কাউকেই, যে আমাকে চিঠি লিখতে পারে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে খামখানা ছিঁড়ে ফেললাম। তমিস্রাব চিঠি।

অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও সত্য। ছোট্ট কয়েক ছত্রের চিঠিখানাব শেষ লাইনটিতে আমার চোখ দুটো যেন আটকে গেল। ফেরত পথে একবার অবশ্যই দেখা করতে লিখেছে তমিস্রা, এ অনুরোধ আরও অবিশ্বাস্য। শেষ পর্যন্ত মনে হল পরিহাস করেছে তমিস্রা। তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করলাম প্রতি ছত্রকে বারবাব।

সারা মন চিন্তায় ছেয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। একটা ট্রেন ছাড়ছে। গৃহগামী সৈনিকের ভীড়ে স্টেশন পরিপূর্ণ। অবশেষে আমার মনও চঞ্চল হয়ে উঠল।

বেকার মস্তিস্ক শয়তানের আড্ডা—কথাটি খাঁটি। সারা রাত্রিব অনিদ্রার মধ্যে আমার বেকার মস্তিস্ক যে শয়তানী মতলবটি স্থির করে ফেলল, তা হল ছুটী পেলে কালকের মেলেই দিল্লীর বাথ রিজার্ভ করতে হবে। এবং তারপর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

কিন্তু নিশ্চিত অধঃপতনেব কবল থেকে আমায় উদ্ধার করল নিয়তি। পবদিনই ছুটীব পরিবর্তে, পেলাম অগ্রগমণের আদেশ। মুভমেণ্ট অর্ডার যেন মুখভঙ্গী করল তমিস্রার চিঠিটাকে।

!

পাঁচই জানুয়ারী প্রভাতের জমাট শীতের মধ্যে বিবাট কন্‌ভয় ছাড়লো পাঠানকোট থেকে। ভোরের পাখীরা তখনও জাগে নি। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গে তখনও পড়েনি স্বর্ণ রেখা। পুরবাসীগণ তখনও গভীর সুপ্তিমগ্ন।

গাড়ীব চাকার প্রতিটি আবর্তনের সঙ্গে যে মাটি পিছনে সরে যেতে লাগল, তাদের জন্য মনে জাগলো আত্মীক দুঃখবোধ। যে পর্বতশ্রেণীকে এতদিন সাগ্রহে দেখেছি, তারা এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। 'রাভী'র সেতু 'মাধোপুর ব্রীজ' পার হয়ে ভারতের সীমানা ত্যাগ করে এলাম। তমিস্রা চলে গেল দুর হতে দূরে। আমাব পরিচিত ভারত অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে সাপেব মতো এগিয়ে চলল কন্‌ভয়।

এই যে দুঃখ বোধ, একে নিতান্ত অহেতুক বলে অবহেলা করবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। রাতের গভীরতায় ঝিমিয়ে পড়া জগতের মধ্যে, আলোকোজ্জল রেল স্টেশনগুলো যখন এক বিষণ্ণতার প্রলেপ দিয়ে যায় আমার মনে, তখন আমি সে

অনুভূতিকে অনুভব করি আয়েস করে—একটু একটু করে। এ দুঃখের মধ্যে আমি পাই এক সূক্ষ্ম আনন্দের রেশ, যা তর্কযুদ্ধে প্রমাণ করা আমার সাধ্যাতীত। সোহল অবশ্য বলেছিলেন, এ হল 'মেলাঙ্কলিয়া'—ক্রনিক চিত্ত-বিষাদ। বন্ধুরা বলত 'মরবিড্'। আব আমাব বক্তব্য ছিল, এ হল অনুভূতি-প্রবণতা। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কারণ তার আছে সেন্টিমেণ্ট। আর মানব-শ্রেষ্ঠ হল সেই, যার মধ্যে এই সেন্টিমেণ্ট হল প্রবল।

সম্পূর্ণ উত্তর দিগন্ত পবিব্যাপ্ত করে আগুণ জ্বলে উঠলো। হিমালয়ের হিমকে কোমল স্পর্শে সম্ভাষণ করল প্রথম সূর্যকিরণ। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল হিমাদ্রী। পশ্চিমের ডালহৌসী উপত্যকা হেসে উঠল সেই দৃশ্যে। লখনপুর—সাম্বা দ্রুত মিলিয়ে গেল পশ্চাতে। তারপর একসময় অকস্মাৎ চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল একটি সহব। নীল আকাশের মধ্যে ঝকঝক করে জ্বলে উঠল একটা মন্দিরের ব্রোঞ্জের চূড়া। জম্মু ও কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী, দ্বিতীয় বৃহত্তম নগবী জম্মু-টাওয়ারীতে এসে থামল কন্‌ভয়।

পথের পরিচ্ছন্নতায়, যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এবং দিগন্ত বিস্তৃত মালভূমির পরিপ্রেক্ষিতে, জম্মু প্রাকৃতিক এবং মানবিক শক্তির এক অপূর্ব সার্থক সমন্বয়রূপে স্বীকৃত হবার দাবী রাখে। নাগরিক সভ্যতার আবর্জনায যখন চোখ জ্বালা করে ওঠে, সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে মন, অপরদিকের উন্মত্ত প্রকৃতি দেয় তখন সান্ত্বনা।

কোমলতার সাথে রুক্ষতার, সৌন্দর্যের সাথে অসুন্দরতার এবং শান্তের সাথে রুদ্রের সার্থক সমীকরণ সম্ভব বলে আমি মনে করি না। এর কল্পনাও আমাব কাছে অসহ্য। ফুলের সৌন্দর্যকে আমি অভিনন্দন করি সুন্দর বলেই। তাই সুন্দর ফুলের মধ্যে তীব্রতম বিষ থাকলেও, আমার সৌন্দর্য-বিলাসকে তা আচ্ছাদিত করতে পারে না। আবার সেই বিষ-শক্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলে, সে ফুলকেও

আমি অবহেলা করি অনায়াসেই। প্রকৃতপক্ষে আমি সৌন্দর্য বিলাসী। আর নারী আমার কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দার্যিক অভিব্যক্তি, অন্তরে তার থাকলই বা সুতীব্র হলাহল। কিন্তু সেই নারীব কাছ থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকি, যখন তাব সৌন্দর্যকে চাপা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে হিংস্রতা, বিষ। সেই নারীকেই যখন কোলকাতার পথে-পার্কে সাতচল্লিশ সনে দৃপ্ত প্যারেডেব মধ্যে দেখেছি, তখন আমার মন ব্যথিত হয়েছে, সামরিক রুদ্রতার প্রভাবে তাদের সৌন্দর্যের অপমৃত্যুতে। দশটা-পাঁচটায় যে সুন্দবীরা পুরুষেব সাথে পাল্লা দিয়ে ট্রামে-বাসে ঠাসাঠাসি করে যাতায়াত করেন, তাদের অব্যক্ত ট্রাজেডী আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব কবি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাব অন্যতম প্রাণ-কেন্দ্র কোলকাতার দৃশ্য যে প্রকৃতিব নিজ ভূমি জম্মুব পার্কে দেখব, এ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি। দলে দলে প্যারেডরতা তরুণীদের দেখে আমি চমকে উঠলাম।

নারী জাগৃতি সম্বন্ধে যাঁরা বক্তৃতা মুখর তাদের আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নাবী সৈনিক আমাকে কেবল একটি ঘটনাই মনে করিয়ে দেয়, তা হল—ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত W.A.C.—উওমেনস্ অক্সিলিয়ারী কোর্। আমাব এ চিন্তাধারাকে জাতীয় চেতনার স্যাবোটেজ বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। একমাত্র কারণ হল যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর বিগত ইতিহাস।

বেতালা মিলিটারী ব্যাণ্ডের সাথে সেই কোমলাঙ্গীবা তাল-বিহীন মার্চ করে বেরিয়ে এলেন সদর রাস্তায়। এ অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁরা এবং আমরা, উভয়েই লজ্জা অনুভব করলাম।

ধীরে ধীরে ট্রানজিট্ ক্যাম্পে এসে থামল কন্‌ভয়।

ক্যাম্পের চারপাইগুলোর একখানা অধিকার করে যখন সবে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি, তখনই আমার ডাক পড়ল। ভাগ্যে বিশ্রাম লেখা নেই। একটানা প্রায় সত্তর মাইল পথ পার হয়ে এসেও, একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের অবকাশ পেলাম না। কোন রকমে খাবার পাট সেরে, প্রস্তুত হলাম আবার চল্লিশ মাইল উত্তরে যাবার জন্য। উধমপুর।

পাঠানকোটের অধিবাসীরা প্রায়ই দূরের ধূমাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর দিকে নির্দেশ করে বলে—উধমপুরকে পাহাড়িয়া। সে উক্তির মধ্যে থাকে ভয়, সম্ভ্রম এবং সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখবার আন্তরিক অভিপ্রায়। সশরীরে স্বর্গ-যাত্রার মহাভারতীয় কাহিনী ভক্তিনত চিত্তে বিশ্বাস করলেও, প্রকৃতপক্ষে সে যাত্রা বোধহয় কারও কাম্য নয়। তাই উধমপুরের পর্বতশ্রেণীর প্রতি তাদের এ অনাসক্তি।

সেই ভয়ানক পর্বতশ্রেণীর ভীতিপ্রদ পথ ধরে এগিয়ে চলল আমাদের গাড়ী। চারদিকের দৃশ্য বুকের উপর যেন পাষাণের মতো চেপে বসেছে। বামে অতল খাদ, দক্ষিণে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো দুরভিগম্য পর্বতের বিরাট শরীর। এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে এক-ফালি পথ। জীবন-মৃত্যুর সন্দেহ দোলায় আমার চিন্তা শক্তি যখন অসাড় প্রায়,তখন হঠাৎ মনে পড়ল জৈন সাহেবের কথাগুলো। সেই সঙ্গে আর একটা কথাও মনের আকাশে চমক দিয়ে গেল— তমিস্রা আমন্ত্রণ জানিয়েছে ফেরত পথে দেখা করতে।

এই চিন্তাকে বোধহয় ব্যঙ্গ করেই এক বিকট শব্দেব সাথে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সহসা স্থির হয়ে পড়ল যন্ত্রাসুর। সব কিছু শেষ হবার ভীষণতা সজ্ঞানে অনুভব করা অসহ্য। চোখ বন্ধ করলাম। ভাবলাম —এইবার···।

পরবর্তি কয়েকটি মুহূর্ত কাটল মর্মান্তিক যন্ত্রনাব মধ্যে। অপেক্ষা করছি—এইবার গড়িয়ে পড়ছে গাড়ী খাদের মধ্যে। কিন্তু বিলম্ব কেন? সন্দেহ হল। চোখ খুলতেই চালক সহাস্যে বলল, নিঁদ টুটী?

লজ্জায় আকর্ণ আরক্ত হয়ে উঠলো। তবু রক্ষা যে চালক ভেবেছিল আমি নিদ্রামগ্ন। রুদ্ধ-প্রায় হৃদয় ফিরে পেল তার স্পন্দন। বিগলিত হাস্যে চালক নিবেদন করল সে একটু ধূমপান করবে।

খাদের ধারে একটা পাথরে বসে বিড়ি টানছে ড্রাইভার প্রীতমলাল। সন্তর্পণে তার পাশে দাঁড়িয়ে অনুমান করবার চেষ্টা করলাম সেখানকার গভীরতা। সম্মুখের অতলান্ত গহ্বরের পরই যে রুক্ষ পর্বত তার রুদ্র-কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে যাচ্ছে প্রৌঢ় সূর্য, তারই শরীরের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি পাইন, প্রচণ্ড পবনে প্রকম্পিত পত্রগুচ্ছ নিয়ে একান্ত সঙ্গীহীন। তার পাশে একখণ্ড মর্মরে দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে পড়ল।

মেজর জেনারেল আত্মা সিং-এর স্মৃতি ফলক।

মেজর জেনারেল আত্মা সিং ছিলেন সেই কৃতী সৈনিকদের অন্যতম, যাঁদের অপরিহার্য মনে করা হত শিশু-রাষ্ট্র ভারতের রক্ষণ ব্যবস্থায়। সেই কুশলী সৈনিক শ্রেষ্ঠ, সেই লৌহ মানব মৃত্যু বরণ করলেন যুদ্ধে নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নয়। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে সৌন্দর্য-স্নাত হিমালয়ে, প্রকৃতির কোলে। এই খানেই বাঁক ঘুরতে গিয়ে নীচে বহু দূরে ওই স্রোতস্বিনীর মধ্যে পিছলে পড়েছিল তাঁর জীপ।

নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওই শঙ্খ-শুভ্র প্রস্তরখণ্ডের দিকে। মনে মনে উচ্চারণ করলাম—'Peace, Peace ! he is not dead, he doth not sleep···'।

উপনিষদের ঋষি সেই মহান পুরুষকে লাভ করবার পন্থা সম্বন্ধে বলেছিলেন—'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দূরত্বয়া, দুর্গম পথস্তৎ······'। এই 'দুর্গম পথস্তৎ' কথাটিতে আমাদের মনের মুকুরে যে ছায়া পড়ে,

তারই বহিঃপ্রকাশ দেখলাম চারদিকে। পুনর্যাত্রার প্রাক্কালে, আকর্ণ-বিস্তৃত আত্ম-স্তুতির হাসির সাথে প্রীতমলাল যা বলল তা কিন্তু এতটুকুও হাস্যের উদ্রেক করলনা আমার ভীতিগ্রস্ত মনে। প্রতিটি বাঁকের মুখে সে কথা আমার আতঙ্কিত কর্ণকুহরে আর্তনাদ করতে লাগল—'ইয়ে কুছ নহি। উধমপুরকে বাদ সিঙ্গল্ রোড হ্যায়। ওহ্ অওর্ খতর্নাখ!'

হিমালয়কে ঘিরে আমার মানসিক সত্তার প্রথম প্রকাশ। বাল্যে হিমালয় ছিল আমার স্বপ্ন। সে স্বপ্নের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল দিদিমার কাছে গল্প শুনে। তারপর সেই হিমালয়কে আমি ভালবেসে ছিলাম

একটানা একটা অলস শব্দ করে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। নিজের অজ্ঞাতেই ভয়ের সমুদ্র পার হয়ে, অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে আমার মন পিছিয়ে গেল অনেকগুলো দিন।—উত্তর বিহারের ছোট্ট একটা সহর। নগরের সীমান্তে একটা দোতলা বাড়ীর দালানের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার জটলা পাকাতে আরম্ভ করেছে। সেইখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার মন।

—'দিদা সেই গল্পটা বল না—সেই শিব ঠাকুর বসেছিলেন উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্যে।

মালা জপতে জপতে দিদিমার মুখ থেকে একটা অব্যক্ত শব্দ বেরুল, হুঁ।

আমার মন কিন্তু অপেক্ষা করতে রাজী নয়। অসহিষ্ণু-ভাবে দিদিমার হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলি, বল না দিদা, সেই যে পার্বতী অনেক—অনেক পূজো করলেন—তারপর?

মালাটা থলির মধ্যে রাখতে রাখতে দিদিমা ধমকে উঠলেন, হতভাগা ছেলের জন্য কি, দু'দণ্ড ভগবানের নাম করবার জো আছে? তমি কই? সে আসে নি?

দিদিমার কোল ঘেষে বলি, সে আসবে না।

—কেন রে কালো, আবার বুঝি তুই মেরেছিস ওকে ? যা হতভাগা, ডেকে নিয়ে আয়। না হলে গল্প বলব না।

পাশের বাড়ীতে তমি তখন বারান্দার উপর পা ঝুলিয়ে বসে বিমর্ষভাবে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। দিদিমা বলেছিলেন তার মা নাকি ওই-খানে গেছেন। ওই তারাগুলির একটাই না কি তার মা।

অপরাধী কণ্ঠে ডাকি, তমি।

—কে ?—চমকে ওঠে তমিস্রা, কে, কালো দা ?

—চল্ তমি, দিদা গল্প বলবে।

চট করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে তমিস্রা। ওর হাসিটা আমাকে যেন মর্মান্তিক আঘাত করে। একখণ্ড দুঃখ, একমুঠো দরদ চেপে ধরে আমার কণ্ঠ। বুঝতে পারি কত অসহায় ও। আমার সামান্য একটু আদর, সামান্য একটু স্নেহের জন্য কতখানি আকুল আর্তি তাকে অবিরত ব্যাকুল করে রাখে। মাতৃহীনা তমির জন্যে আমার মন হঠাৎ যেন কেঁদে ওঠে। চোখের জল চেপে তার হাতখানা ধরে বলি, চল্।

—ভাব তো ? চোখের জল আর মুখের হাসি এক সঙ্গে মিলে ওকে আরও করুণ করে তোলে। অবরুদ্ধপ্রায় স্বরে বলি, হ্যাঁরে, ভাব, ভাব, ভাব।

একটা কর্কশ শব্দ করে প্রীতমলাল গাড়ীর গীয়ার চেঞ্জ করল। গোঁ গোঁ শব্দ করে ঝাকুনী দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলল চড়াই পথে। মনে হল যুগ যুগান্তর ধরে আমি পথ চলছি।

পার হয়ে গেল কতগুলো বছর। প্রতি প্রভাতে আর সন্ধ্যায় দোতলার ছাদ যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকত। ভোরে একটু

একটু করে ফুটে উঠত সূর্য আর উত্তর দিগন্তে আকাশের গায়ে ফুটে উঠত ধীরে ধীরে একটি আঁকাবাঁকা স্বর্ণরেখা। নির্নিমেষ চেয়ে থাকতাম সেইদিকে। সেই রেখা সূর্যের আলোয় একটার পর একটা হিমাদ্রী শিখরের রূপ নিয়ে ফুটে উঠত।

—ওইটে কৈলাশ, গম্ভীরভাবে আমি বলতাম।

—দূর, তমিস্রা ব্যঙ্গ করে উঠত, ওটা সব চেয়ে উঁচু দেখছিস না। ওটা হল এভারেস্ট।

আমার কিন্তু সবচেয়ে বড় মনে হত কাঞ্চনজঙ্ঘা আর ধবল-গিরিকে। চিনতাম না আমরা কাউকেই, কিন্তু সেই অপরিচয়ের প্রাচীর আমাদের আনন্দকে বাধা দিতে পাবে নি। তমিস্রাব ব্যঙ্গ আমাকে উত্তেজিত কবে তুলত, বলতাম, তুই ছাই জানিস। যাকগে বিকেলে গড্উইনঅস্টিন্ দেখাব। উজ্জ্বল সূর্যের নীচে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত হিমালয়।

এ ছিল আমাদের একটা নেশা। অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্যের ছোঁয়াচে উত্তর দিগন্ত হয়ে উঠত স্বর্ণময়। পশ্চিম কোণের সবচেয়ে উঁচু শিখরটিকে দেখিয়ে বলতাম, ওই দেখ তমি মাউণ্ট গড্উইন অস্টিন্। হিমালয়ের প্রায় সমস্ত চূড়াগুলোর নাম আমার ছিল মুখস্ত।

—সত্যি? তমিস্রার চোখে ফুটে উঠত অকৃত্রিম বিস্ময়।

—হ্যাঁরে। ভূগোলে দেখিস। সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রের কথায় ক্লাশ সেভেনের ছাত্রী বিন্দুমাত্র সন্দেহ করত না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে যাবার পর নীচে নেমে ভূগোল খুলে বার করতাম, দি গ্রেট হিমালয়ান্ রেঞ্জ। তমিস্রা এসে পাশে বসত। আমার ইংরেজী জ্ঞান প্রকাশের এ সুযোগ ছাড়তাম না। ভূগোল বন্ধ করে ইংরেজী বই খুলে ধীরে ধীরে পড়ে যেতাম—'Far away on a snow slope leading up to the ridge, I noticed a tiny object moving and approaching the rock. A second

object followed. These two objects were Mallory and Irvine........The scene was veiled again in mist. Shortly afterwards there was a snow storm, and neither he nor anyone else ever saw them again.' একটা পরিপূর্ণ রোমান্সের স্পর্শে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। চোখের সামনে যেন দেখতে পেতাম মেলোরী আর ইরভীন্-এর বিন্দু দুটো মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত তুষার-সমুদ্রে। তমিস্রার বড় বড় চোখ দুটো চেয়ে থাকতো বোবার মতো।

উত্তরকালে তমিস্রা মিলিয়ে গিয়েছিল ঘন তমসার মধ্যে। সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলাম হিমালয়ও যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। 'ভীখ্‌না থোরী'র তরাই জঙ্গলের ডাকবাংলোয় আমার হৃদয়ের মধ্যে যে হিমালয়কে অনুভব করেছিলাম একদিন, তা ক্রমশঃ আমার কাছে একটা স্বপ্ন হয়ে গেল। বারবার পড়েছি 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজ', কিন্তু আর সে অনুভূতি পাই নি। কতদিন হিমালয়ের দিকে পিপাসার্ত দৃষ্টি মেলে মনে মনে কামনা করেছি যেন মৃত্যুকালে তার স্নিগ্ধ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত না হই; পাই যেন তার অনাবিল শান্তির ছোঁয়াচ। কিন্তু আজ আবার তার কোলে এসে আমি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পড়লাম।

শুধু চোখ চেয়ে দেখলেই যে দেখা হয় না, তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। যুগ-যুগান্তর ধরে চেয়ে দেখেও হিমালয় আর তমিস্রা, দুই-ই আমার কাছে রয়ে গেছে দুর্বোধ্য। তাদের সান্নিধ্য পেয়েছি কিন্তু মন পাই নি, পাই নি অনুভূতি। দুরন্ত অশান্তিতে আমি হয়েছি ক্ষত-বিক্ষত।

তাই আজ হিমালয়ের হৃদয়ে এসেও, আমি তাকে পেলাম না আমার হৃদয়ে। হিমালয় আমার কাছে ধরা দিল না। তার

শরীরকে পেলাম, স্পর্শ করলাম হাত আর চোখ দিয়ে, কিন্তু অন্তর পেলাম না। তাই আমার মনে বাঁচবার আশা প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠল, যেমন একদিন তমিস্রার সান্নিধ্য আমাকে দূরের ইশারায় উন্মত্ত করেছিল। বুঝতে পারলাম না—এ বাঁচা, বাঁচা নয়।

পথের 'মাইল-স্টোন'-এ দেখলাম উধমপুর এগিয়ে আসছে। মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম, এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার যখন কোন উপায় নেই, তখন এই সুদীর্ঘ কষ্টসাধ্য যাত্রাপথে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্য, তার আদিম নগ্নতা এবং ভয়াবহ রুদ্রতা প্রাণ ভরে দেখে নেব। বারংবার প্রার্থনা করলাম, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কামনা করলাম আরও—আরও—'To-morrow to fresh woods and pastures new.' মরতেই যদি হয় দুর্ঘটনায়, তবে এ ক্ষোভ যেন না থাকে যে এ সৌন্দর্যের সামান্যতম অংশও আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। ক্ষুধার্তের মতো সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে আমি হিমালয়ের সৌন্দর্য পান করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে যন্ত্রের আসুরিক আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে পড়ল চারদিকে পর্বতবেষ্টিত উধমপুরের নিস্তব্ধ ক্যাম্পে। অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ইঞ্জিনটা যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। পথের 'মাইল-স্টোন'-এ দেখলাম ২৫০০ ফুট।

চতুর্দিকে ধ্যান-মৌন পর্বত, তার মধ্যে ছোট্ট এতটুকু ক্যাম্প। তিন মাইল দূরে আরও প্রায় এক হাজার ফুট উপরে এক পর্বত-শিখরে উধমপুর শহর। এই অনাবিল শান্তি আর নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার পবিত্র পরিবেশের মধ্যে যেন একটি আকস্মিক ঔদ্ধত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সারা শরীরে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে—সরকারী অফিস্, কাছারী, স্কুল, হাস-পাতাল আর অবিশ্বাস্য হলেও একটি প্রেক্ষাগৃহ।

পরদিন প্রভাতের স্বচ্ছ আকাশ সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল।

বরফের পাহাড়ের মধ্যে পাইন-এর বনগুলো মনে হচ্ছিল যেন কাশ্মীরের সৌন্দর্য-তিলক। নির্জন ক্যাম্পে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম শূন্য মনে। বিশ্বের স্যাংগ্রীলা, ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্য-শ্রেষ্ঠ নগরী শ্রীনগরের একমাত্র পথ 'বানিহাল্ পাস্' তুষারমণ্ডিত হওয়ায়, বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে শ্রী। ভাগ্য আমার প্রতিকূল।

চারদিকে পাথরের মতো স্তব্ধতা। হঠাৎ সে স্তব্ধতার সমুদ্রে আলোড়ন জাগলো। একটা ট্রাক্ আত্মপ্রকাশ করল ক্যাম্পের গেট-এ। দ্বিতীয় অতিথির আগমন সম্ভাবনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

কথা বলার যে কী আনন্দ, সেইদিন বুঝলাম। আমি বাঙালী। জমিয়ে আড্ডা দেবার নেশা আমার শরীরে সংক্রামক ব্যাধির মতো প্রতি ধমনীতে সংক্রমিত। এই কয়েকদিনের অসহায় মৌনতায় আমি উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। পবিচয় আদান-প্রদানের পালা সমাপ্ত হতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হল না। তাবপব এই স্মরণীয় ঘটনাটিকে উদ্‌যাপন করবার জন্য তুজনে বেরিয়ে পড়লাম যে-দিকে তুচোখ যায়।

বন্ধুব কাছে উধমপুর নতুন নয়। অসংখ্য নালা আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তিনি আমায় নিয়ে চললেন নতুন থেকে নতুনতর জগতে। সৌন্দর্যের নেশা আমাকে উন্মত্ত করে দিল। প্রকৃতির এ জগতে এখনও বিজ্ঞানের রূঢ় স্পর্শ লাগে নি। ডিনামাইট-এর ক্ষত এখনও হয় নি পাহাড়গুলোর শরীরে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে সৌন্দর্য-সুধা আকণ্ঠ পান করেও আমার মন তৃপ্ত হল না। কিসের একটা অভাব অনুভব করতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম পরিচিত আবেষ্টনীতে, একটা চা-এর দোকানের হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে।

তুপাশে ঠাসাঠাসি দোকান। মাছির আসর এবং বাজারের

কোলাহলের মধ্য দিয়ে যে সরু পাথর বাঁধান পথটি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, বন্ধু বললেন, সেইটাই হল উধমপুরের রাজপথ। চা-বিলাসী আর যে কয়েকজন বসেছিল আমাদের আশে-পাশে, তাদের শরীরের তুর্গন্ধে চা-এর পিপাসা আমার তখন অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন যখন আবার গান ধরল—'এক্ দিল্‌কে টুক্‌রে হজার্ হুয়ে', তখন আমার পরিচিত জগত যেন পলকে হাজির হল।

কাশ্মীর এবং তার সৌন্দর্যমণ্ডিতা নারীদের সম্বন্ধে বহু রূপকথার কাহিনী শুনলেও, তাদের সম্বন্ধে আমার কোন 'প্রী-কন্‌সিভ্‌ড্ ফিলসফি' অথবা সংস্কার ছিল না। কিন্তু অপরিষ্কার শতছিন্ন বস্ত্রে যৌবনশ্রীকে অসীম যত্নে আবৃত করে যে ষোড়শী আমার কাছে একটা পয়সা ভিক্ষা চাইল, হিন্দুস্তানের বাদ্‌শাহ হলে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতাম না তাকে আমাব হারেমে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে। অপরিসীম দারিদ্র্যের পেষণে দলিত হয়েও সে আপন মহিমায় আপনি ভাস্বর। নভেম্বরের আপেলও সঙ্কুচিত হবে তার গালের রক্তিমতার তুলনায়। সামনের সু-উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্বতশিখরটিও লজ্জিত হবে তার স্তনযুগলের মহিমায়। তার রক্তকমল আননের কোমল ব্রীড়া ঈর্ষার উদ্রেক করবে যে-কোন নববধূর মনে। তার ঘন-কালো চোখ অপেক্ষা রাখে না কাজল অথবা সুর্মার। ক্ষণতরে মনে হল কাশ্মীর যেন মানুষের শরীর নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য যাঁরা যান শ্রীনগরে, পহল্‌গামে অথবা গুল্‌মার্গে, তাঁদের হিসাবী-মনকে আমি সসম্মানে নমস্কার করি। এ কথা তাঁদের তবু অজ্ঞাত থেকে যায় যে, কাশ্মীরের সৌন্দর্য শ্রীনগরে তো নেই-ই, নেই হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গেও, নেই কাশ্মীর উপত্যকায়, ডাল্ অথবা নাগিন্ লেকের

নীল জলে, নেই ধনী-গৃহে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য নিদারুণ শীতে পত্র-বিহীন বৃক্ষের নিঃশব্দ প্রতীক্ষায়, পাইন ও পপ্‌লারের আরণ্যক আদিমতায়, গ্রামে গ্রামে উপেক্ষিত দারিদ্র্যের মধ্যে। এ সৌন্দর্যের জন্য যেতে হবে নৌসেরা, বাজৌরী, পুঞ্চ এবং সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে হৃদয়।

বন্ধু ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগের অফিসার। বিকেল পাঁচটায় তিনি 'ওয়েদার্ ফোর্‌কাস্ট' করলেন—আবহাওয়া পরিষ্কার যাবে এবং বানিহাল উন্মুক্ত হবে অচিরেই। মনে আবার জাগলো আশা, কিন্তু কল্পনাও করতে পারি নি যে, এ ফোর্‌কাস্ট আবহাওয়া অফিসের ফোর্‌কাস্ট-এর মতই অবিশ্বাসযোগ্য।

সন্ধ্যা থেকেই আকাশের রূপ পরিবর্তিত হতে শুরু হল। বিকেল পাঁচটায় যে আকাশ ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল স্বচ্ছ, সন্ধ্যা সাতটায় তা ঢেকে গেল খণ্ড খণ্ড মেঘে। চির-চঞ্চল হিমালয়ের অস্থির উদ্দামতা আত্মপ্রকাশ করল। বন্ধুর ফোর্‌কাস্ট এবং আমার পুনরুদ্দীপ্ত আশাকে নির্মূল করে দিয়ে, রাত দশটা থেকে আরম্ভ হল প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। সেই দুর্যোগের মধ্যেই বন্ধুবর পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলেন জম্মু। আমি আবার অসহনীয় একাকীত্বের সমুদ্রে ডুবে গেলাম।

বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বাংলার বর্ষাও হার মানল এর কাছে। তাঁবুর বাইরে বেরুবার উপায় নেই। তাঁবুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে দেখছিলাম প্রকৃতির তাণ্ডব। ক্যাম্পের পিছনের নালাটা গৈরিক জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অসংখ্য ছোট বড় জল-প্রপাত ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ছে তার উপর। চারদিকের পরিবেষ্টন রচনাকারী পাহাড়গুলো হয়েছে অদৃশ্য। তুষারপাত হচ্ছে তাদের উপর। মেঘে আর বরফে মিলে মিশে সব একাকার হয়ে গেছে। পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ শিখা। বজ্রপাতে কেঁপে উঠছে সারা উধমপুর। মনে

হল প্রলয়কাল উপস্থিত। ব্যারোমিটারের পারা নেমে চলল দ্রুত গতিতে—ত্রিশ, আটাশ, ছাব্বিশ, কুড়ি, উনিশ। তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আরম্ভ হল শুধু শিলাবৃষ্টি। 'গগনে গরজে মেঘ', কিন্তু বাংলার 'ঘন বরষা' এ নয়। এ হল কাশ্মীরের শীতঋতু, এক মৌসুমী পরিহাস।

তাঁবুই হয়ে উঠল আমার বিশ্ব। সব কটা গরম কাপড় গায়ে চাপিয়ে উপর থেকে চারটে কম্বল আর গ্রেট কোট দিয়ে ঢেকে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম বিছানায়। আপাততঃ আমার আর কিছু করবার ছিল না। টেলিফোনেই আদেশ পেয়েছিলাম, বারামূলা যাবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে।

বরফের মতো সন্ধ্যা নেমে এলো জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। ঝড় আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। মেঘের দল যেন মেতে উঠল এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। শত-সহস্র বজ্র ও বিদ্যুতের তাণ্ডবে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বার বার ঝলসে যেতে লাগল। তাঁবুর মধ্যে স্তিমিত লণ্ঠনটা দুলছে অসহায়ভাবে। মৃদু হলদে আলোয় কেমন যেন করুণ মনে হতে লাগল তাঁবুর ভিতরটা। আমার ভ্রমণ সঙ্গিনী সঞ্চয়িতা খানা বার করলাম।

'সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা,'···

—সাব, পেগ চাহিয়ে?

চমকে উঠলাম। অশরীরি প্রেতাত্মার মতো আবছা অন্ধকারে মেস্-বয় কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সামলে নিয়ে বললাম, লাও।

আবার সঞ্চয়িতার দিকে চোখ ফেরাতেই তমিস্রা উঁকি দিয়ে গেল মনের পর্দায়। জানি তমিস্রার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কই চুকে গেছে। সোহলের থিয়োরী অনুযায়ী কনট্রাক্ট ভ্যালিড না হয়ে, হয়েছে ভয়েড। জানি, এ চিন্তা শুধুই বর্ধিত করবে আমার

চিত্তের অস্থিরতা। কিন্তু তবুও সেদিন উধমপুরের দুর্যোগ-মুখরিত রাত্রে সঞ্চয়িতাখানা খুলেই মনে পড়ে গেল তাকে। কারণ তার বিবাহের পূর্বে যে-জিনিসটি সে আমার কাছে মুখফুটে চেয়ে নিয়েছিল, তা ছিল একখানা সঞ্চয়িতা। আর সেই সঙ্গে অনুভব করলাম, সেই তমিস্রাকে আজ আমি কতখানি ঘৃণা করি।

তমিস্রা যে-দিন চিরতরে ফিরে এসেছিল তার পিতৃগৃহে, সে-দিন আমার যে দুঃখ হয়েছিল, তা তার বিবাহের দিনের চেয়ে অনেক বেশী। তাকে আমি শুধু ভালই বাসতাম না। স্নেহও করতাম। কি একটা দুর্ঘটনায় তার ইঞ্জিনীয়র স্বামী বিবাহের মাত্র ছ'মাসের মধ্যে মারা গেলে, এ রকম অপয়া বধূকে বাড়ীতে স্থান দিতে রাজী হল না কেউ।

বিয়ের দিন দুঃখ হয়েছিল তাকে চিরদিনের জন্য হারালাম ভেবে। কিন্তু সান্ত্বনা পেয়েছিলাম তার মুখের হাসি দেখে। আমি তাকে না পেলেও সে সুখী হোক, এই প্রার্থনাই সেদিন করেছিলাম আন্তরিকভাবে। সেই তমিস্রাকে বিধবার বেশে দেখে আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। অকুণ্ঠিত স্নেহ আর প্রেম নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম তার চরম দুঃসময়ে।

আমাকে দেখে তমিস্রা তখন আকুল হয়ে কাঁদছে। অনুভব করলাম, এ অসহ্য দুঃখ শুধু তমিস্রারই নয়, আমারও। তারপর থেকে চলেছিল তার একটানা কাঁদবার দিন।

অনেক বিনিদ্র রজনী চিন্তা করে কাটিয়ে দিলাম। শেষে এক দিন মন স্থির করে তাকে বললাম বিয়ের কথা। বোঝালাম, বিধবা বিবাহ দোষের নয়, সমাজ এবং আইন উভয়ই তাকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিছুদিন ধরে তমিস্রার মধ্যে যে ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলাম, তা মুহূর্তে ফুটে উঠল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল তমিস্রা।

তার রুগ্ন, বিবর্ণ মুখ কালো হয়ে উঠল ক্রোধ আর ঘৃণায়। অত অশ্রু, অত কাতরতা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। তমিস্রা, যে কোনও দিন আমাকে অবিশ্বাস করে নি, বাল্যে যে আমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে নিঃশব্দে, সেই তমিস্রা গর্জন করে উঠল,—অসভ্য জানোয়ার, বেরিয়ে যাও।

আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম। লজ্জায়, ঘৃণায় আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তবুও সস্নেহে বললাম, আমি তো অন্যায় কিছু বলি নি তোমায়। আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসি। সেই ভালবাসাকে বিবাহের বন্ধনে বাঁধা তো অন্যায় নয়।

নারীর চিরন্তন হিংস্রতা আত্মপ্রকাশ করল তমিস্রার মধ্যে, দেবতার মতো স্বামী হারিয়ে আজ আমি অসহায় আর তুমি সেই সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করতে এসেছো আমার ?

কোন উত্তর দেবার মতো প্রবৃত্তি হলো না। অকস্মাৎ দারুণ ঘৃণায় আমার সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। প্রেমিকা তমিস্রার মধ্যে যে কুৎসিত নারীটি আত্মগোপন করে ছিল, তা হঠাৎ বেরিয়ে এলো আমার সামনে। ঘৃণা হলো, এই নারীকে একদিন ভাল বেসে ছিলাম।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম ওদের বাড়ী থেকে। মনে হল একটা বিকট দুর্গন্ধ যেন পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে।

কবিতার অক্ষরগুলো যেন ঝড়ের সাথে মাতামাতি আরম্ভ করেছে—

'আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার বসিয়া আছে,
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে হৃদয় নাচে...'

পরদিন প্রভাতে তাঁবুর দরজা খুলতেই আমার হৃদয় মুখর হয়ে উঠল, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর'। কবিতাটি যেন এক নতুন জগতের দ্বার খুলে দিল আমাব কাছে।

মেঘের দল উধাও হয়েছে। গভীর নীল আকাশে পূর্বাশার এক উজ্জ্বল পাহাড়ের পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে প্রভাত-সূর্য। সে রশ্মি অনন্ত তুহিন রাজ্যের উপর এঁকে যাচ্ছে হাজার রামধনুর আলপনা। মৃদু প্রভাত-সমীরণে শিষ দিচ্ছে পাইন। তার সাথে সম রেখে সঙ্গীত-মুখর হয়ে উঠেছে দলে দলে নাম-না-জানা পাখী। পিছনের নালাটির রিকেট্ শরীরের প্রতিকোণে এসেছে যৌবনের ডাক। কলহাস্যে, উচ্ছল হরিণীর মতো আছড়ে পড়ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। হাস্যে-লাস্যে, দৃপ্ততায়, উন্মত্ততায়, উদ্বেলিত—উন্মুক্ত কাশ্মীর।

আমার দুঃখ এই যে, এত সুন্দর এত সঙ্গীতময় এত নিস্তব্ধ উধমপুরকে কেউ গণ্য করে না কাশ্মীরের মধ্যে। সম্মান দেয় না আভিজাত্যের। 'রাভী'কে দক্ষিণে সীমানা রেখে, উত্তরে জম্মু উধমপুর, রামবান এবং উত্তর-পশ্চিমে নৌসেরা, রাজৌরী, পুঞ্চ নিয়ে যে বিস্তৃত রুক্ষ অঞ্চল অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকে টুরীস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে, তারা কাশ্মীরের সঙ্গে এক আসন পায় নি। এরা হল ইতরজন, ভঙ্গ।

কৌলীন্যগর্ব কিন্তু আরম্ভ হল রামবানের পর থেকেই। চীনাবের হাত ধরে যে আঁকা-বাঁকা পথ চলে গেছে সবুজ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি সুদৃশ্য পুল পর্যন্ত, সেই পুলই হল ইতর রাজ্যের শেষ। ওপাশে পথের আরম্ভেই একটি সিংহদ্বার দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় অক্ষরে 'ওয়েল্‌কাম্‌' লেখা নিয়ে। গণিকা কাশ্মীর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে টুরিস্টদের।

কিন্তু কাশ্মীরের খাস্‌মহলে প্রবেশের পূর্বে আর একবার মাথা

নীচু করে কুর্ণীশ করতে হবে দ্বার-রক্ষী পীরপঞ্জালকে বানিহালে। প্রফুল্ল হাস্যে, অব্যর্থ কটাক্ষে কাশ্মীর তবেই অক্টোপাস্-বন্ধনে আবদ্ধ করবে দিউয়ানা-দের। গণিকা হলেও এ কাশ্মীর হল বংশানুক্রমিক কুলীন। এ কৌলীন্যের সনদ সে পেয়েছিল মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর অলিখিত ইতিহাসের কয়েকটা পৃষ্ঠা কল্পনা করা যাক। দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুঘল সম্রাট তখন দিল্লীর মস্‌নদ্-এ। তখ্‌ত-ই-হিন্দ এ বসে সারা হিন্দুস্তাঁ পায়ের তলায় রেখেও মনে শান্তি নেই। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন মনে হয় ভ্যাকুয়াম্। শাহেন্‌শাহ মন-মরা হয়ে থাকেন।

মুঘল রাজবংশের রক্তের ধারায় ছিল রোমান্টিসিজম্। রুক্ষ দিল্লী আর শুষ্ক রাজনীতি নিয়ে দিন আর কাটে না। ইতিমধ্যে একদিন পেশাওয়র-এর সেনাপতি রাজকার্যে এলেন রাজধানীতে। শুনলেন এই অঘটনের কথা। মনে মনে কিছু চিন্তা করে নিয়ে একদিন এসে কুর্ণীশ করে দাঁড়ালেন দরবারে। জানালেন তখ্‌ত্-ই-হিন্দ এর উত্তর-পশ্চিমে যে বিরাট ভূখণ্ড দিবারাত্র শাহেন্‌-শাহ্-এর গুণগানে মুখরিত, সেখানে আছে শাতিল্-আবরের স্নিগ্ধতা, বসরাই গুলাব-এর প্রাচুর্য এবং কান্দাহারের বল্‌বল। সেখানকার প্রজারা শাহেন্‌শাহকে একবার দর্শন করে ধন্য হতে চায়। শাহেন্‌শাহ-এর রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হল।

তারপর একদিন দেখা গেল শেরশাহ-এর তৈরী পথ, বর্তমানের গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশাওয়র গুজরাট হয়ে চলেছে এক অপূর্ব দৃশ্য। বহুমূল্য অলঙ্কার এবং পোষাকে সজ্জিত বিরাট বিরাট হাতীর পিঠে সোনার হাওদায় বসে আমীর এবং ওমরাহ্‌রা। দলে দলে মুঘল সৈনিক। উট, ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে আর টানাগাড়ীতে মণ-মণ

রসদ। পাহাড়ের পর পাহাড পার হয়ে সে কাফীলা অদৃশ্য হয়ে গেল উত্তরের পথে। শ্রীনগরে এসে শাহেন্‌শাহ আরামের নিঃশ্বাস ফেলে মেহদী আর আতর মাখা দাড়িতে হাত বুলিয়ে রায় দিলেন—দেহলীর মতো খারাপ জায়গা তামাম্ দুনিয়ায় আর নেই।

এলেন শাহেন্‌শাহ আকবর। তিনি ছিলেন কেবলমাত্র রাজনীতি-বিলাসী। শ্রীনগরের আধুনিক হরিপর্বতের উপর গড়ে উঠল বিরাট পাথরের দুর্গ আর প্রাসাদ।

এলেন জাহাঙ্গীর—দি মোস্ট রোমান্টিক প্রিন্স অফ দি ইস্ট; আনারকলির ট্রাজেডীতে তার হৃদয় তখনও উদ্দাম। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে ডাল হ্রদের পাশে তৈরী করলেন মুহব্বত কী মঞ্জিল শালীমার বাগ, ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে। শান্তি পেয়েছিলেন কি মনে? কি জানি! তারপর নূর-ই জাঁহার ভাই আসফ খাঁ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে তুললেন ডাল্-এর উপর নিশাতবাগ।

সেই দিন থেকে কাশ্মীর হারাল তার ভার্জিনিটি। পরিবর্তে পেল কৌলীন্যের সনদ।

বর্তমানে ফিরে আসা যাক। এই কৌলীন্যের কমপ্লেক্স এবং সমস্ত অলিখিত বাধা নিষেধ কিন্তু তুলে নেওয়া হয়েছে বামবানের পর থেকে। বানিহালে ত্রিরাত্রি বাস করে এসে কাশ্মীর ভ্রমণের গর্ব নির্ভয়ে করা যেতে পারে, বানিহাল পাস্ পার না হয়েও; কাশ্মীর ভ্যালীতে পদার্পণ না করেও, নিশ্চিন্তে ঘোষণা করা যেতে পারে—শ্রীনগর ভ্রমণ করে এলাম।

কিন্তু এটা সেকুলারিজমের যুগ। তাই অচ্ছুতের মধ্যে গণ্য করলেও, জম্মু শহরকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানীর মর্যাদা দিয়ে একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা জানেন না, শীতকালে শ্রীনগর যে কেবল হতশ্রী তাই নয়—বসবাসেরও অযোগ্য। শীতকালে জম্মু উপভোগের সামর্থ্য যাদের নেই, তারা

বরফ আঁকড়ে পড়ে থাকে সেখানে। আর উইন্টার ক্যাপিটাল জম্মুতে আসেন শ্রীনগরের ধনীরা চেঞ্জের উদ্দেশ্যে। এ হল কাশ্মীরী এরিস্টোক্রাসির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিন্তু গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর থেকে, শীতকালীন রাজধানী জম্মু কোনও অংশেই কম নয়,—বলেছিলেন ডাঃ হুববন্স্ সিং গ্যাডগিল্। ডাঃ গ্যাডগিল্ পাঞ্জাবী, কিন্তু জম্মু তাঁর জন্মভূমি। জম্মুর প্রতি তাঁর নাড়ীর টান থাকা স্বাভাবিক। উত্তর দিয়েছিলাম, এ কিন্তু আপনার একচোখোমী। গরমের দিনে যেখানে ব্যারোমিটারের পারা একশ' দশ ডিগ্রীতে উঠে থাকে, তার সাথে শ্রীনগরের তুলনা। শ্রীনগরে না গিয়েও আমি তার পক্ষে ওকালতী করলাম।

গ্যাডগিল্ উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন, মানে?

বললাম, আহা-হা, কাশ্মীর ভ্যালী—সে যেন আমার বাংলা দেশ। দুপাশে ধানের ক্ষেত, চারদিকে জল আর সবুজের বাহার। এর সাথে আপনি তুলনা করছেন জম্মুর।

মাশাল্লাহ্! এ আপনি কি বলছেন, গ্যাডগিল্ হতাশ হয়ে আমার আশা ছেড়ে দিলেন।—এ জায়গার আপনি কতটুকু দেখেছেন? নৌসেবা, রাজৌরী, পুঞ্চ, উধমপুর, খুদ্, বাটোট্—দেখান তো এদের মতো রুখী-সুখী অথচ সুন্দর জায়গা? খুঁজে দেখুন তো কোথাও পান কিনা এখানকার 'চশ্‌মা'র মতো ঠণ্ডী পানী? দেখান তো নেচার আর কোথায় নিজেকে এমন ভাবে খুলে দিয়েছে বে-শরম্ হয়ে? দেখান তো নার্গিস্-এর মতো আর একটি ফুল তামাম দুনিয়ায়? গ্যাডগিলের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠল।

হাসতে হাসতে বললাম, একটা তামাশা করছিলাম শুধু।

এই নিয়ে দিল্লগী? জানেন, এটা আমার জন্মভূমি? আমার পাঞ্জাব আর আমার জম্মু, দুই আমার কাছে এক। পাঞ্জাবের

সঙ্গে এর নাড়ীর টান কত গভীর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, আমাদের মতো লোকের সবচেয়ে বড় কামনা হল, সুখী রৌটী, ঠণ্ডী পানী।

মনে মনে সেদিন গ্যাডগিল্‌কে শ্রদ্ধা না করে পারি নি। দুদিনের অতিথি আমিও তাঁরই মতো ভালবেসে ফেলেছিলাম জম্মুকে।

অনাহুত বর্ষা যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনই অকস্মাৎ বিদায় নিল। নির্মেঘ নীল আকাশ, দূরে ও নিকটে কালো পাহাড়ের নিঃশব্দ ইশারা, এই প্রচ্ছদপট নিয়ে নেমে এলো সেদিনের রাত। সে রাত ছিল রোমাঞ্চকর। এবং সেই সন্ধ্যাতেই পেয়েছিলাম আমার যাত্রার আদেশ।

আমি জম্মুকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভালবেসে ফেলেছিলাম এই বনভূমিকে, এই মাটী আর আকাশকে, পাহাড় আর ঝর্ণাকে—আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিবিড় করে। তাই বারামূলার পরিবর্তে প্রায় আড়াই শ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে পুঞ্চ যাবার আদেশ পেয়ে, আমার দুঃখিত হওয়া উচিত না হলেও দুঃখ বোধ করলাম।

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও এক সর্বজনীন দুর্বলতা আজও রয়ে গেছে তার মধ্যে—তা হল ভালবাসা। আবার, এই দুর্বলতা শুধু মানুষেরই আছে তাই, সবার উপরে মানুষ সত্য। যুগে যুগে মহাজনেরা নির্দেশ দিয়েছেন এই প্রেমের পরিধিকে কেন্দ্রীভূত না করে ছড়িয়ে দিতে। শত দুঃখ, শত অত্যাচার করেছো, তাই বলে কি প্রেম দেব না? বাইবেলের supremacy of love, রাজনীতির universal brotherhood, এই প্রেমেরই আর এক রূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিশ্বপ্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

বিফল হল সেই কারণেই, যে-কারণে সারা জম্মুপ্রদেশকে ভালবেসেও আমার মনে দুঃখ জাগলো উধমপুরকে ত্যাগ করবার কল্পনায়। সেই মহামানবের মহত্ত্বকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি, যিনি ভালবাসতে পেরেছিলেন এই পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজকে। শুধুমাত্র একজনকেই নয়—যিনি ভালবেসে ছিলেন পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণাকে। কিন্তু তবুও আমার দুঃখ ছিল সত্য, অকৃত্রিম। ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি সমাজবাদী নই। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই আমি সবচেয়ে বড় বুর্জোয়া।

আমি মহামানব নই। তাই সেই চন্দ্রালোকিত বিদায়-নিশীথে আমার মনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। সে যামিনীর শেষে, আকাশের পশ্চিম কোণের এক ঘনকালো পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল ত্রয়োদশীর চাঁদ। বাঁকা হাসির কটাক্ষ হেনে, প্রভাতের আগমনে প্রিয়তম-বিচ্ছিন্না, বিদায়-বেদনা-বিধুরা অভিসারিকার তীব্র বেদনার বীভৎসতাকে প্রচ্ছন্ন রাখবার বিফল প্রয়াসের মতো। উধমপুরের তন্দ্রাজড়িত পথ 'চমকি উঠিল' ট্রাকের বিকট হুঙ্কারে, 'সুপ্ত পৌরজন' সেই স্বরে শিহরিত হয়ে উঠল। দ্রুত মিলিয়ে গেল উধমপুরের বীজ।

জম্মুকে ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করে, চৌকিচোরার ঘাটী পার হয়ে, সুন্দরবাণীকে পিছনে ফেলে, কাঁচা রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার অবগুণ্ঠনে নৌসেরায় এসে নামলাম। সহকর্মী সুবেদার-মেজর ভেঙ্কটস্বামী আইয়ার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে আমাকে অভিভূত করে ফেললেন। বারংবার বলতে লাগলেন, ফর্ হেভ্ন্স্ সেক্, আমি যেন তাঁকে একেবারে নিজের লোক বলে মনে করি। জানালেন যে আমার জন্যই আজ তিনদিন ধরে তিনি নৌসেরায় অপেক্ষা করে আছেন, টু রিসিভ দি বেবী সোল্জার্।

নবাগন্তুকের কাছে লজ্জা ঢাকবার জন্যেই লুণ্ঠিতা, অপমানিতা, ধর্ষিতা নৌসেরা সেই সন্ধ্যা থেকেই মেঘের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে

রেখেছিল। হয়তো তার মনে পড়ে গিয়েছিল উনিশ' শ সাতচল্লিশ সালের সেই অশুভ প্রভাত

১৯৪৭ সাল। একটি বিশেষ দিন।

জ্যোতিষীরা কি বলবেন জানি না কিন্তু আমার মনে হয় সেদিন কাশ্মীরের ভাগ্যে সপ্ত গ্রহের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রতিদিনের মতো সেদিনের প্রভাতেও কমনীয় আলস্যে শয্যাত্যাগ করলো নৌসেরা। তারপর ঘাঘরা দুলিয়ে রঙীন ওড়না আলতোভাবে বুকের ওপর ফেলে মাথায় কলসী নিয়ে, মেয়েরা নেমে গেল চশ্‌মার ধারে। চোখে তাদের তখনও রয়ে গেছে রাতের স্বপ্ন আর মুখে কাজলের বিক্ষিপ্ত স্পর্শ।

পুরুষেরা বসলো আয়েশ করে হুঁকো নিয়ে।

হঠাৎ পাহাড়ের আড়াল থেকে উঠলো নারকীয়, বিজাতীয় শব্দ। রাইফেল্‌ আর মেসিনগান্‌, মর্টার আর টুয়েন্টি ফাইভ পাউণ্ডার, স্টেন্‌ আর ব্রেন্‌গান্‌—এ সবের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য তাদের কখনও হয় নি। প্রকৃতির কোলে অব্যাহত শান্তি আর প্রশান্তির মধ্যে তাদের কেটেছে জীবন। তাই নৌসেরা আশ্চর্য হবার সময়ও পেল না। ঝটিকা বাহিনীর মতো পাকিস্তান সৈন্য আর উপজাতীয় হানাদারেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ নৌসেরার উপর।

এদিকে ছিল কাশ্মীর সরকারের জে এণ্ড কে মিলিশিয়ার একটি ইউনিট। কিন্তু ইংরেজের আওতায় থেকে তারা কোনদিন যুদ্ধ করে নি। মিলিশিয়ার অফিসার এবং সিপাহীরা সবে তখন মুখে দাঁতন দিয়েছে। সেই অবস্থাতেই, বিনা-যুদ্ধে নৌসেরা বেদখল হল। যে-সব মেয়েরা নেমে গিয়েছিল চশমার ধারে, তাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

কাশ্মীর-রাজ মহারাজা হরি সিং আর প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্রকাক

তখন শ্রীনগরে রাতের নেশায় মশগুল্। একটি একটি করে কাশ্মীর-ইতিহাসের সাদা পৃষ্ঠাগুলো রক্তাক্ষরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। লুট। খুন। মেয়েমানুষ—হ্যাঁ, চম্মণের বুলবুল্, নিয়ে চল এদের। দখলী জমি তো সব পাকিস্তান সরকারের। কিন্তু এগুলো তো আমাদের।

আল্লাহ্ রহমানেরহীম্, তোমার কি এতটুকু দয়া নেই? মেহেরবান্, তোমার সব রহম্, সব মেহর্বাণী কি শুকিয়ে গেছে?

আল্লাহ্‌র দরবারে সে আওয়াজ পৌঁছেছিল কি না জানি না। কিন্তু সে ক্রন্দন আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

গনগনে ফায়ার প্লেসের ধারে খাবার টেবিলে বসে, প্রিপারেটরী টু ডিনার, আইয়ার সায়েব বার করলেন ডুবোতল প্‌-এক্স্। সে রাম্-এর রং আর বোতলের আকার দেখে আমার অন্তরাত্মা যত শুকিয়ে উঠতে লাগল, ভেঙ্কট স্বামী ততই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলেন তার গুণকীর্তনে। আহা-হা, ফর্ হেভন্‌স্ সেক্, কি রং—! ব্লাডি ব্লাড-রেড। ইট্ ইজ সিম্পলী লাভলী ট্ হ্যাভ এ সিপ অফ দিস্ ব্লাডি স্টাফ।

হোস্ট এর কাজ করলেন নিজেই। নিজহাতে মিক্সচার্ তৈরী করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে আধসেরী এক মগ।

আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তখন দ্রুত হয়ে উঠেছে। কুণ্ঠিতভাবে বললাম, এতখানি চলবে না। পেগ খানেক দাও, মেরে কেটে—জাস্ট এ পেগ টু কিপ কম্পানী।

ও হেল্, আইয়ার আঁতকে উঠলেন।—জানো, আমি ফরটি-ফাইভ, এণ্ড স্টিল গোয়িং স্ট্রং। তার কারণ—জাস্ট দিস্। তোমার ওই সিক্‌লী হেল্‌থ— ওই রোগা লিক্‌লিকে চেহারা। ওতে তো আরও চাই, টু কিপ ইউ আপ।

আইয়ার পাকা পোড় খাওয়া সৈনিক। হাতে-খড়ি হয়েছিল

তাঁর বাগদাদে—এক পেগ দিয়ে। আর পাকা হতে হতে তা ঠেকেছে পুরো এক বোতলে। নিজের আমেরিকান গুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একবার ক্রস করে নিয়ে বললেন, লুক্, বাইরে কি প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি হচ্ছে—হেল্। কিন্তু পুরো আধবোতল র এক চুমুকে খেয়ে নৌসেরার চক থেকে সোজা হয়ে হেঁটে আসতে পারি। ইউ লাইক্ টু সী? হেল্।

ত্রস্তে বললাম, না না, প্রমাণ চাই না। তোমার কথাই যথেষ্ট।

বন্ধু এক চুমুকে সিকি মগ খালি করে বাঁ-হাত দিয়ে মুখ সাপটে নিয়ে বললেন, এ আর কি দেখছো। আমার গুরুদেব---মে হীজ্ সোল্ রেস্ট্ ইন্ পীস্—একদিন আড্ডা দিতে দিতে শেষ করেছিলেন কম্‌প্লিট্ দু বোতল। ইয়েস্। সে রাতেই আবার তাঁর ছিল গার্ড ডিউটি। রাত তখন বোধহয় একটা। গোটা দুই তিন আরবী—চোরই হবে বোধহয়—ঢুকে পড়েছিল ক্যাম্প এরিয়াতে। আর যায় কোথায়। গুরুদেবের রাইফেল-এর শব্দে যখন আমরা বেড়িয়ে এলাম, তখন দুটো স্টোন্ ডেড্।

সগর্বে আমার দিকে তাকালেন আইয়ার। তারপর বললেন, চল হেড কোয়ার্টারে। আই উইল্ ট্রেন্ ইউ আপ্। পাকা সৈনিক না তৈরী করে কেন যে ওরা পোস্টিং করে।—রেকর্ডের প্রতি বিরক্তিতে তাঁর মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

সে রাতে মেস্ থেকে যখন ফিরলাম, তখন হাত ঘড়িতে একটা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকী ছিল।

ভেঙ্কট স্বামী পুরো এক বোতলই শেষ করেছিলেন, আর আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে সোজা হয়ে মার্চ্চ করে ফিরেছিলেন ব্যারাকে।

ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাসে নৌসেরা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। এখান থেকে একটু দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মদান করে-

ছিলেন একজন খ্যাতনামা সৈনিক—ব্রিগেডিয়ার্ ওসমান। ঝঙ্করের তীর্থক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন পথে নৌসেরা সহরের মধ্য দিয়ে জীপ্ চলছিল ধীরে ধীরে। ভেঙ্কট স্বামী ছিলেন নীরব। চার-দিকের ধ্বংসস্তূপ যেন ফিস্ ফিস্ করে উঠল—দেখে যাও, কি অত্যাচার করেছে পাকিস্তানীরা। পেনাল কোডের কোন অপরাধই বাদ পড়েনি। তারপর, পালাবার পথে তারা ধ্বংস করল এই সুন্দর শহরটিকে। জীপ্ শহরের বাইরে আসতেই আইয়ার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওঃ, কি হরিব্ল্। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে এখানে এলে। আকণ্ঠ শুকিয়ে যায় পিপাসায়। আই অফুলী ফিল্ ফর্ এ ড্রিঙ্ক, ম্যান্।

সন্ধ্যা থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। সামনের ত্রে-মাথা পাহাড়টা আধো-আলো আধো-আঁধারে দৈত্যের মত মনে হচ্ছিল। পিছনে বিরাট পাহাড়ের প্রাচীর সোজাসুজি চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। শুষ্ক, বন্ধুর, ঝল্সানো পাহাড়। মনে হল, নৌসেরার সমস্ত হত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা যেন একজোট হয়ে ইশারা করছে ওপারের পাকিস্তানী সৈনিকদের দিকে। অভিশাপ দিচ্ছে তাদের। সমস্ত প্রকৃতি যেন বিষণ্ণ, দুঃখে স্তব্ধ। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হুড়মুড় করে এসে পড়ল পশ্চিম থেকে। মুখর হয়ে উঠল পাইনের দল। তাদের কথা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।—কেন যুদ্ধ করে মানুষ? কেন করে খুনোখুনি? তুমিও তো তাদেরই দলের, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি। যে বালক হয়েছে পিতৃহারা, যে স্ত্রী হয়েছে স্বামীহারা, যে-মাতা হয়েছে সন্তানহারা, তাদের কাছে কি জবাব তোমার? বল—উত্তর দাও।

সর-সর্ সর্-সর্—আর্তনাদের পর আর্তনাদ করে চলেছে পাইনের দল। আমি দাঁড়িয়ে আছি স্তব্ধ হয়ে অপরাধীর মতো। ভিতরে ভেঙ্কট স্বামীর নাক ডাকছে। আমি কেন নিশ্চিন্ত হয়ে

নিদ্রা যেতে পারি না ওর মতো? কারণ, আমি পাকা সৈনিক নই। হয় আমাকেও হতে হবে পাকা সৈনিক, নয় ত্যাগ করতে হবে সৈনিক-বৃত্তি।

শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম পাকা সৈনিকই হবো। অবশিষ্ট রাত নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় কাটল। স্বপ্ন দেখলাম রাইফেলের অব্যর্থ নিশানায় মেরে চলেছি একটির পর একটি মানুষ, আর সেই মৃত মানুষগুলো মুহূর্তে জেগে উঠছে ঝাঁকড়া পাইনের শরীর নিয়ে। তারপর তাদের সরু সরু পাতার আঙ্গুলগুলো আমার দিকে তুলে বলছে—এইটা-এইটা-এইটা।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বুকের মধ্যে কেমন খালি মনে হচ্ছে। মাথাটা ফাঁকা। বাইরে ছুঁয়ে যাচ্ছে তরুণ রোদ। আর দূরের চাঁদমারী থেকে এল্ এস্, জী'র শব্দ ভেসে আসছে—টা-টা-টা।

বাইরে একটা ট্রাক প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে সুবেদার মেজর যখন আর এক রাউণ্ডের আমন্ত্রণ জানালেন, তখন আমার মাথায় খুন চেপেছে—পাকা সৈনিক হতেই হবে। আইয়ার খুশী হয়ে বললেন—দ্যাট্স্ লাইক্ এ গুড্ চ্যাপ্। রাতের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে এর চেয়ে ভালো ওষুধ আর নেই। লেট্স্ ড্রিঙ্ক্ ইওর্ হেল্থ্।

ক্লান্ত সূর্য ঢলে পড়ল রাওলপিণ্ডির কোলে। বিধ্বস্ত রাজৌরীকে একটু স্পর্শ করে আমাদের আস্তানায় এসে প্রবেশ করলাম। চারদিকে পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল! মনে হল যেন অনন্ত পর্বত-সমুদ্রের একটা দ্বীপে এসে আমরা আশ্রয় নিলাম।

ভেঙ্কট স্বামী এখানেই থেকে যাবেন। আমাকে কালই যেতে হবে এগিয়ে। যে-পথ ফেলে এসেছি পিছনে, আর সামনে অপেক্ষা করছে যে পথ, তাদের ভয়াবহতা অবর্ণনীয়। এ পথের তুলনায়

উধমপুরের পথ ছিল সৈয়দ্ আমীর আলী এভেন্যু। উধমপুরের পথে দুর্ঘটনার আশঙ্কা যদি ছিল এক, এখানে একশ। পাহাড়ের গা কেটে সদ্য তৈরী কাঁচা রাস্তা, গাড়ীর ওজন আর শব্দে কাঁপতে থাকে আমার প্রকম্পিত বক্ষের মতোই। চালকের সাথে তুলনা করতে ইচ্ছা হয় পার্থ-সারথীর। এতগুলো মানুষের জীবন-মৃত্যুর সূত্র হাতে ধরে সে চলেছে। স্টিয়ারিং হুইল্-এর সামান্যতম ভ্রান্তি আমাদের নিক্ষেপ করতে পারে হাজার ফুট নীচে। সেখানে পাইনের দল প্রতিহিংসায় আনন্দিত হয়ে মর্মর ধ্বনি তুলবে। উন্মত্ত পাহাড়ী নদীটি হয়তো একটু থমকে দাঁড়াবে। তারপর সুর মেলাবে পাইনদের সাথে।

ভীম্‌বর্ গলি। কত পথিক এখান থেকে হয়েছে নিখোঁজ। কত গাড়ী হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এই ভীম্‌বর্‌গলিব পাঁচহাজার চারশ পনের ফুট উঁচু পাস্ দেখেই, অতীতে কত দিগ্বিজয়ী বাহিনী করেছে পশ্চাদপসরণ। সে সব আজ চাপা পড়েছে ইতিহাসের ঝরা পাতায়।

বহু শতাব্দীর পর সেই ভীম্‌বর্ গলির পাস্-এর উপর এসে দাঁড়ালাম আমি—আর একজন সৈনিক। দিগ্বিজয়ের সামান্যতম স্পর্ধাও যদি আমার মনে উঁকি দিয়ে থাকে, তবে তা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল।

উত্তরে থাকে থাকে নেমে গেছে পাহাড়ের পর পাহাড়; তারপর মিলিয়ে গেছে প্রায় দুহাজার ফুট নীচের এক সমতল প্রান্তরে। গাঢ় সবুজ রং সে সমভূমির। ওপাশে আবার উঠেছে পাহাড়ে-সিঁড়ি। সে সিঁড়ি বিলুপ্ত হয়েছে পর্বতের পর পর্বত-সমুদ্রের মধ্যে—মাথায় তাদের অনন্ত তুষারের মুকুট। উত্তরের দিগন্ত ব্যাপৃত করে মহাসমুদ্রের তরঙ্গের মতো চলে গেছে পেশাওয়র আফগানীস্তানের দিকে। এর পাশে নিজেকে মনে হল এক অতি

অসহায় শিশু। এই যে ভয়ঙ্কর, এই যে মহান, এই যে অমিত-শক্তিধর মহাসৌন্দর্যশালী 'দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজ', এর কাছে আমার অস্তিত্ব কতটুকু? আমার সভ্যতার, আমার বিজ্ঞানের, আমার শক্তির কতটুকু স্থান এই বিরাটের কাছে? এই যে নীরব, নিথর স্তব্ধতা; এই যে গম্ভীর, মহিমান্বিত শান্তি, এর মাঝে মূর্তিমান অশান্তির মতো, দানবের মতো, স্যাটানের মতো, আমি এসেছি একে অপবিত্র করতে। এই মহামৌন, ধ্যানমগ্ন যোগীর ধ্যানভঙ্গ করবার স্পর্ধা কত অকিঞ্চিৎকর এবং কত না হাস্যকর মনে হল।

বিরাট দেহের মতো, হিমালয়ের অন্তরও বিরাট। তাই মানুষকেও সে স্থান দিয়েছে তার দেহের উপর। পাহাড়ের গায়ে নীড় বেঁধেছে মানুষ। কঠিন পরিশ্রম করে চষেছে মাটি। হিমালয় দিয়েছে তাদের অফুরন্ত আশীর্বাদ। ভয়ঙ্কর অট্টহাস্যে ছুটে চলেছে ঝর্ণা, কিন্তু তার স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেনি সবুজ গমের ক্ষেতকে।

দূর থেকে ভেসে আসছে মোরগের ডাক। একপাল মেষ ও ছাগল নিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে কৃষক-বধূ। মুখে তার অপার তৃপ্তির ছাপ, চোখে তার অনির্বচণীয় শান্তির আবেশ। আর আমার সভ্যতা আমাকে দিয়েছে শুধু অশান্তি আর অতৃপ্তি। আমি যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলে আসতে পারি নি হিমালয়ের ছায়ায়, তেমনি বিশ্বাস করতে পারি নি আমার পরিচিত জগতকে। সন্দেহ আর অবিশ্বাস আমাকে করেছে স্বর্গ ভ্রষ্ট। তাই আজ আমার মনে সন্দেহ জাগে তাঁদের কথায়, যাঁরা বলেন, চিত্ত যার হয়েছে বিক্ষিপ্ত, দুঃখে যে হয়েছে জর্জরিত, আধুনিক হত্যাকারী বিশ্ব যাকে ভীতি-বিহ্বল করেছে, তাকে ডাক দিচ্ছে হিমালয়। অমৃতের পুত্রকে ডাক দিচ্ছে দেবতার আত্মা।

বাঁ দিকের সরু পথ ধরে ধীরে ধীরে গাড়ী নেমে চলল সেই প্রান্তরের দিকে। অতি সাবধান তার গতি। প্রান্তর পার হয়ে আবার উর্ধগামী হল গাড়ী। হঠাৎ অনুভব করলাম, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। গাড়ীও যেন পরিশ্রান্ত। একটানা টপ্ গিয়ার-এ চলেছে গোঙাতে গোঙাতে। দক্ষিণে পাথরের দেওয়াল। বাঁ দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। অতল খাদ আরম্ভ হয়েছে একেবারে গাড়ীর চাকা ঘেঁষে। ছ হাজার বত্রিশ ফুট উচু আর একটা পাস্— কৃষ্ণা ঘাটি।

কৃষ্ণাঘাটি। ড্রাইভার এবং আরোহীদের হৃদকম্পকারী কৃষ্ণা-ঘাটি। পাঞ্জাবী ড্রাইভার পরস্পর দেখা হলেই প্রবাদ বাক্যের মতো আবৃত্তি করে- -'বচ্ মোড় দা'—মোড় বাঁচিয়ে চল। রক্ত-লোলুপ পিশাচের মতো পাথরগুলো যেন চেপে ধরতে চায় চারদিক থেকে। গভীর পাইনের জঙ্গল যেন হাঁ করে গ্রাস করতে আসে। নৌসেরা—পুঞ্চ সেক্টারের মহাকাল কৃষ্ণাঘাটিতে এসে যন্ত্র এবং মানুষ সবাই হাঁফাতে লাগলাম।

সামান্য একটু স্থিতি! একটু কোলাহল! আবার পথ।

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার তখন দ্রুত পদক্ষেপে ধেয়ে আসছে অরণ্যানী থেকে। তবুও আমাদের থামবার সময় নেই। 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে' যদিও 'মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,' তবুও আমরা অন্ধ পথিক; আমাদের পাখা বন্ধ করবার সময় নেই।

ডালিমের বন, ঘন পাইন অরণ্য, সমস্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলো। বনের আড়াল থেকে ফুটে উঠল পুঞ্চ নদীর ওপারের রাজপ্রাসাদ মতিমহল। কাঠের ঝোলান ব্রীজ পেরিয়ে, করদরাজ্য পুঞ্চের রাজধানী, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের তৃতীয় নগরী পুঞ্চ-এ এসে ক্লান্ত গাড়ী যেন মুখ থুবড়ে পড়ল। সুদীর্ঘ যাত্রার শেষে

আমাদের স্যাংগ্রীলা, তার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের আহ্বান জানাল।

পর্বত-দুহিতা পুঞ্চের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। একপাশে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পুঞ্চনদী, বিপুল বেগে এক পর্বত থেকে আর এক পর্বত পেরিয়ে। চারদিক থেকে ঘিরে আছে পীরপাঞ্জাল রেঞ্জ-এর নানা শাখা-প্রশাখা আর 'সীজ্-ফায়ার লাইন'। সম্পূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে একমাত্র সবুজের নগরী পুঞ্চ।

নিত্য নতুন রূপে দেখা দেয় পুঞ্চের প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। অদূরের তুষারাচ্ছন্ন পীরপাঞ্জাল যখন প্রভাত-সূর্যের স্পর্শে আরক্ত হয়ে ওঠে তখন হয়তো অলক্ষ্যে প্রস্তুতি চলেছে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার।

বাংলা সাহিত্য বর্ষার ঝঙ্কারে মুখরিত। সে ঝঙ্কার যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে জেগে উঠেছে নানা রাগ-রাগিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বসন্তপঞ্চমীর প্রভাত থেকে, অকাল বরষার আহ্বান সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে, যে আকাশ আত্মপ্রকাশ করল পুঞ্চের উপর, তার বর্ণনা আমি কোথাও পাইনি। মেঘে মেঘে আবৃত হল গগন। প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে আরম্ভ হল আকুল বর্ষণ। পর্বতগুলো অদৃশ্য হল। ব্যারোমিটারের যে পারা ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছিল, তা হঠাৎ নেমে এলো দ্রুত গতিতে। শীতের শেষে এবং বসন্তের প্রারম্ভে, পুঞ্চে আরম্ভ হল বর্ষা।

এটা কিন্তু হবার ছিল না। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ওই যে আপেল, আখরোট, নাসপাতি আর চেরী গাছগুলো দাঁড়িয়ে ছিল শীর্ণ পত্র-বিহীন শাখা বিস্তার করে, যার উপর বসে পাখীরা বসন্তের নেশায়

বুঁদ হয়ে গান গাইতো, তাতে আসবার কথা ছিল জন্মের ইঙ্গিত। পপ্‌লার আর দেওদারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হবার কথা ছিল বসন্ত-বাহারের।

পুষ্পের এই রিক্ত, সর্বহারা ভাব আমাকে ব্যথিত করে তোলে। মতিমহলের বাগানের সযত্ন-প্রতিপালিত সভা পাইন, আর অদূরের পাহাড়ের অযত্ন-বর্ধিত পাইনের বন, আমার মনে এক অদ্ভুত বেদনার স্পর্শ এনে দেয়। পাহাড়ের বরফগুলো গলে গিয়ে যখন আরম্ভ হয় সাদা-কালোর লুকোচুরী, তখন সারা বিশ্বে যেন 'ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি।' শোকার্ত আপেল আর চেরী গাছগুলোর অশ্রু যেন 'আকাশে পড়ে গড়ায়ে।' উদ্বেলিত ক্রন্দনে অবরুদ্ধ বনভূমি কেঁদে ওঠে—

'মম যৌবন দ্রাক্ষা-নিকুঞ্জে,
কেন বাঞ্ছিত ফিরে যাবে কাঁদিয়া।'

কিন্তু বাঞ্ছিত তবুও ফিরে যায় বিফল আশায় বিক্ষুব্ধ মনে। কাশ্মীরের, হিমালয়ের, আপেল আর নাসপাতি বনের, পপ্‌লার আর পাইন দলের একান্ত বাঞ্ছিত বসন্ত ফিরে গেল অসহ্‌ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে বর্ষার তাণ্ডব দেখে।

এমন দিনে আমাদের মেস্‌-এ প্রবাহিত হয় সুরার মন্দাকিনী। ভেঙ্কট স্বামীর বিখ্যাত ব্রাণ্ডি বেড থ্রি-এক্স্‌ এর প্রবাহে আত্মসমর্পণ করে শিবনেত্র হয়ে আস্বাদন করা হয় পাকা-সৈনিক জীবন-রসের।

অদ্ভুত গাম্ভীর্যে মেসের আবহাওয়া শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ফায়ার প্লেসের উদ্দীপ্ত অগ্নির শ্বাপদ নিঃশ্বাস, গ্লাশের মধুর ঝঙ্কার এবং বারিধারার অক্লান্ত ক্রন্দন, সৌন্দর্য বর্ধিত করে সে নৈঃশব্দের। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন সে নৈঃশব্দের উপর দেয় বিষণ্ণতার প্রলেপ। জমাদার জঙ্গ বাহাদুর, যাঁকে এতদিন ধরে দেখেছি স্বল্পবাক্‌ স্থির, গম্ভীর—তাঁকে সেদিন দেখলাম অন্যরূপে।

এই কঠিন কঠোর সৈনিক-শ্রেষ্ঠ পুরুষের স্তিমিত নেত্রে সর্বদা দেখেছি এক নিরাসক্ত, নির্বিকার দৃষ্টি। মুখে এক অব্যক্ত বেদনার আভায। সেই আনন আরক্ত হতে দেখেছি প্রতি সন্ধ্যায় ফায়ার-প্লেসের ধারে সুরাপূর্ণ বক্তিম গ্লাসের সাহচর্যে। অসীম কৌতূহলকে দমন করে অনুমান করবার চেষ্টা করেছি তাঁর অন্তরেব গভীরতম প্রদেশের বেদনার্ত ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়। কিন্তু সফলকাম হইনি। নেপালের অধিবাসীদেব মুখ দেখে তাদের মনোভাব অনুমান করা দুঃসাধ্যই নয় অসাধ্য। শুধু আমাব কাছেই নয়: মিঃ শার্লক হোম্‌সের কাছেও।

কিন্তু সেদিন, এই স্বল্পবাক সৈনিকের হৃদয়েব অবরুদ্ধ দুয়ারও উন্মুক্ত হল বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকাবে। বাইরে তখন চলছিল বাতাসের দাপাদাপি, অশ্রান্তধাবায় বৃষ্টি ঝরছিল অবিরাম। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল পৃথ্বী। পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলে সে গর্জন ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছিল, যুগ যুগ ধরে চেপে রাখা প্রকৃতির কোন এক গোপন কাহিনী। বাজপ্রাসাদ মতিমহলের গগন চুম্বী চূড়া স্তব্ধ বিস্ময়ে ছিল নিস্তব্ধ। এমন সময় জঙ্গ বাহাদুব আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করলেন তাঁব হৃদয়। দেখলাম প্রস্তরের মধ্যে প্রাণ; অনুভব কবলাম কঠিন কঠোবের কল্পনাতীত কোমলতা।

দূব-প্রাচ্যের যুদ্ধ তখন সমাপ্ত-প্রায়। জাপশক্তির আত্ম-সমর্পণেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রেজিমেণ্ট মুভ্‌ করেছে টোকিওয়। আনবিক গৌরবে মিত্র শক্তি উদ্ধত। বিশ্ববাসী ভীত, সন্ত্রস্ত। পরাজিত জাপান পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো রুদ্ধ আক্রোশে বিক্ষুব্ধ। এমন সময় একদিন অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ল বিস্মৃত-প্রায় গৃহকোণ, প্রিয়ার বিলুপ্ত-প্রায় মুখচ্ছবি, একমাত্র কন্যার অভিমানভবা নয়ন।

জাপানের ঘরে ঘরে তখন অশ্রু। কত ঘর হয়েছে নিশ্চিহ্ন, কত সুখী সংসার হয়েছে বিক্ষিপ্ত। এমনই এক অনাথা জাপানী

বালিকা যেদিন তাঁর হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিকে অকস্মাৎ স্পর্শ করে গেল এক হোটেলের দরজায়, সেই দিন ঘটল অঘটন। সুদীর্ঘ সৈনিক-জীবনে তিনি ছুটী নিয়েছিলেন যতবার, তা মুখে মুখে হিসাব করা যায়। চার বছর পূর্বের এক বিদায়-বেদনায় অভিষিক্ত প্রভাত অকস্মাৎ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল তাঁর মনে; টোকিওর পথের এক সাধারণতম দৃশ্যে। উদ্বেলিত করে তুলল তাঁর স্থির কঠিন হৃদয়কে। মনে পড়ল, তাঁর মেয়েটিও ঠিক এমনই করুণ বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে চার বছর আগে।

কিন্তু সে সময়ে ছুটী সহজলভ্য ছিল না। অনেক চেষ্টা করে ফিরে এলেন ভারতে।

ক্ষণিক বিশ্রামের অবসরে ভদ্রলোক পরিষ্কার করে নিলেন তাঁর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ। অগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, ছুটী পেলেন?

নিঃশব্দে গ্লাশ তুলে নিলেন জঙ্গ বাহাদুর। বেরিয়ে এলো শুধু একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।

দিনের পর দিন গড়িয়ে চলল মন্থর গতিতে। প্রতিটি দিন তাঁব কাছে তখন এক একটি বছরের সমান। পত্রালাপের উপায় নেই, আর সে ধৈর্যও ছিল না। হিমালয়ের যে গহন প্রদেশে তাঁর গ্রাম, সেখানে ডাকের ব্যবস্থা নেই। নিকটতম রেলস্টেশন থেকে সেখানে পৌঁছতে লাগে এক সপ্তাহ। চিঠি পাওয়া যায় তখনই, যখন কোন সৈনিক অবসর শেষে ফিরে আসে সেই গ্রাম থেকেই।

আবার চুপ করলেন ভদ্রলোক। কঠোর হৃদয় সৈনিকের চোখে সেদিন দেখলাম অশ্রু। যে-নয়ন নির্বিবাদ হত্যার দৃশ্যেও কোন দিন সামান্যতম কম্পিত হয় নি, যে চোখের সামনে ঘটে গেছে একটি বিশ্বযুদ্ধ, যে চক্ষুর স্থির, নিঃশব্দ, তীক্ষ্ণ নিশানা প্রিয়হীন করেছে কত প্রিয়াকে, আশাহীন করেছে কত প্রোষিতভর্তৃকাকে, সেই আতঙ্ক-জনক চোখ দুটি পরিপূর্ণ অশ্রুভাবে অসহায় হয়ে উঠল। …নং গোর্খা রাইফেলস্-এর সিনিয়র জে, সি, ও, রুমালে চোখ

ঢাকলেন। আমরা নির্বাক ভাবে বসে রইলাম। মাতাল বাতাস আছড়ে পড়ল বন্ধ জানালার উপর। অকস্মাৎ বজ্রপাতে চমকে উঠল পুঞ্চ। ঝন্ ঝন্ করে আর্তনাদ করে উঠল শার্সিগুলো।

গ্লাশটি খালি করে আবার আরম্ভ করলেন জঙ্গ বাহাদুর। এমনই একজন গৃহাগত সৈনিকের হাতে তিনি একদিন পেলেন একটি চিঠি; লিখেছেন গ্রামের মুখিয়া। স্ত্রী তাঁর মারা গেছেন তিনমাস আগে। একমাত্র কন্যাটিকে মুখিয়া নিজের বাড়ীতে এনে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে যায় নি। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে গৃহদ্বারে বসে অপেক্ষা করেছে পিতার।

একান্ত অনুগত এবং স্থির-চিত্ত সৈনিকের হৃদয়ে সেদিন উঠল পাহাড়ী বন্য ঝড়। দরখাস্ত করলেন ছুটীর, অন্যথায় গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন ইস্তফার।

যে দিন তিনি বাড়ী পৌছলেন, তার কয়েকদিন আগে মারা গেছে তাঁর একমাত্র সন্তান, এই বিরাট বিশ্বে তাঁর একমাত্র আপন জন।

সচেতন হয়ে দেখলাম, শূন্য গ্লাশগুলো কখন যেন ভরে দিয়ে গেছে মেস্ বয়।

আত্রী চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শঙ্করলাল আত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পুঞ্চ পোষ্ট-অফিসে। সে পরিচয় করে যে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পৌছেছে জানতে পারি নি। অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছি তাঁর বাসায় নানা গল্পের মধ্য দিয়ে।

আত্রী খাস কাশ্মীরী চোস্ত হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে পারেন অনর্গল, আর প্রশংসা করেন বাঙলা ভাষার—যার প্রথম পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন আমার কাছেই। পড়াশোনা ছিল ভদ্রলোকের। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গী, গালীব্ আর হাফিজের সাথে।

জমিয়ে আড্ডা দেওয়া, আর প্রাণ খুলে হাসা, এ হল কাশ্মীরী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দূর থেকে আমাকে দেখেই বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে কলরব করে উঠলেন—আইয়ে, আইয়ে। হাঁকে ডাকে তাঁর ছোট্ট বাসাটি সরগরম হয়ে উঠল। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে অনর্গল কাশ্মীরী ভাষায় যা বলে গেলেন তার মর্মার্থ নিজেই তর্জমা করে বুঝিয়ে বললেন যে, দোস্তের আগমনে তাঁর গরীবখানা আজ ধন্য হয়ে গেল।

আমিও কম যাই না। খাস ইউ-পি, পাঞ্জাব আর কাশ্মীরে কাটিয়েছি বেশ কিছু দিন। বিগলিত ভাবে আদাব্ করে বল্লাম, কথাটা ঠিক হল না। আপনার দৌলৎখানায় এসেই আপনার গরীব দোস্ত্ আজ ধন্য হয়ে গেছে।

হো-হো করে ফেটে পড়লেন আত্রী। বেশ কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে এক নিঃশ্বাসেই হাঁক দিলেন—রহমৎ, চায় লাও। তারপর একটু দম নিয়ে বল্লেন, জানেন, সেদিন স্কুলে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। আপনাদের সবারই নামের পিছনে একটা করে 'নাথ' অথবা 'চন্দ্র' থাকে। কেন বলুন তো?

বুঝলাম, রহস্যপ্রিয় আত্রী কিছু একটা মতলব ঠিক করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম?

এই ধরুন না কেন, রহস্যের আভাসে আত্রীর চোখ দুটো কুঁচকে এলো—রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, তারপর সুভাষচন্দ্র, অনুকূলচন্দ্র আর এই ধরুন আপনারটাই।

বললাম, কেন, আপনাদেরও তো আছে—যেমন প্রেমনাথ।

আবার একদফা হাসির গমকে চারদিক কেঁপে উঠল। অতিকষ্টে দম নিয়ে বললেন, ওটা তো আপনাদেরই ছোঁয়াচ। আপনিই না সেদিন বলেছিলেন, সেই কোন অতীতে কতগুলো বাঙালী এসে কাশ্মীরের রাজাকে হত্যা করে কি একটা প্রতিশোধ নিয়েছিল। তারা তো আর ফিরে যায়নি।

হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, শুধু তাই নয়। ওই 'নাথ' আর 'চন্দ্র'-তে কত কবিত্ব আছে ভেবে দেখুন তো। বাঙলার আকাশে বাতাসে কবিতা কি না, তার ছোঁয়াচ পড়েছে আমাদের নামের ওপর।

বাঃ, ওর থেকে বেশী কবিত্ব তো আমাদের নামে মশাই। আমাদের পদবীগুলো দেখুন তো—কোয়েল, কাক, বকুলা—সব পাখীর নাম।

সোৎসাহে বললাম, বাঃ, বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল যে বাঙালী আর কাশ্মীরী একই। বেদে বাঙালীদের বলেছে বয়াংসী অর্থাৎ পাখী।

আত্রীর তৃতীয় দফার হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই রহমৎ হাজির হল নানারকম মশলা দেওয়া সুগন্ধী কাশ্মীরী চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে খবরের কাগজখানা টেনে নিলাম। হঠাৎ আত্রী প্রশ্ন করলেন—আজকের কাগজ দেখেছেন? আব্দুল্লাহ্ কি বলেছেন?

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। উত্তরের অপেক্ষা না করেই আত্রী বললেন, উনি বলেন কাশ্মীর না কি ভারত এবং পাকিস্তান দুয়েরই বন্ধু। আবার সেদিন রনবীরসিং পুরাতে বলেছেন, কাশ্মীর হল নাইন্টি নাইন পারসেণ্ট স্যভরেন্ স্টেট্। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে লোকটার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারপর আমার

দিকে ঝুঁকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, আমার কিন্তু মশাই রকম সকম ভাল মনে হচ্ছে না। শেষে আবার পাঞ্জাব আর বাঙলার অবস্থা এখানেও না হয়।

বললাম, নাইন্টিনাইন পারসেণ্ট স্যভরেনিটির স্বপ্ন তো মহারাজা হরি সিংও দেখেছিলেন। তারপর পাকিস্তানের এক ধমকেই ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট অফ এক্সেশন্-এ দস্তখত করবার পথ পান নি। আর তা ছাড়া জম্মু প্রভিন্স তো হিন্দু মেজরিটি। অনেক রিফ্যুজী এসেছে, সব জঙ্গী পাঞ্জাবী। এখন আবার ভয় কিসের।

আত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন। পলিটিক্স হল বন্ধুর অন্যতম ফেভারিট সবজেক্ট। এবং এই পলিটিক্স আলোচনা করবার সময়েই তার ভিতরের বিজ্ঞ মাস্টারমশাইটি যেন আত্মপ্রকাশ করেন। বললেন, সেইখানেই তো আরও ভাবনা। ইংরেজরা চলে যাবার পর মহারাজা হরি সি -এর মতিগতিতে কিছু রাখা-ঢাকা ছিল না। তিনি ছিলেন খোলাখুলিভাবে কংগ্রেস বিরোধী, এর স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নে বিশ্বাসী। কিন্তু আব্দুল্লাহ্, – প্রথমে ইনি ছিলেন হিন্দুবিরোধী তারপর হলেন মহারাজা-বিরোধী, পাকিস্তানীরা পালাবার পর হলেন পাকিস্তান-বিরোধী। আর ওয়াশিংটনের ভোজ খেয়ে এখন হতে চলেছেন ভারত বিরোধী। আর, জঙ্গী পাঞ্জাবী,—ওদের সমস্ত জোশ বিলকুল খতম্ হয়ে গেছে পশ্চিম-পাঞ্জাবে মার খেয়ে। জানেন, মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন্ হল ভয়। ওরা ভয় পেয়েছে, ফলে হয়ে গেছে কায়র-ভীরু। এখন একমাত্র ভরসা হলেন আপনারা। আমি বলে রাখলাম, যেদিন আপনারা কাশ্মীর ছেড়ে যাবেন, সেইদিনই আব্দুল্লাহ্ কোম্পানীর মুখোশ খসে পড়বে।

এ সন্দেহ দেখেছিলাম জম্মুর গ্যাডগিল্ এবং আরও অনেকের মনে। তবুও বললাম, কিন্তু এখানকার আম্-জনতা—এরা তো পাকিস্তানকে চায় না।

'হ্যাঙ্গ ইওর আম্ জনতা, শঙ্করলাল আত্রী হতাশভাবে বললেন ;

আম্ জনতার আবার কোন মতামত আছে না কি? দেখছেনই তো, এই রাফ্ ব্যারেন ল্যাণ্ড্ চারদিকে ঝলসানো পোড়া পাহাড়, এখানে না আছে জীবন, না আছে কোনও আকর্ষণ। এদের একমাত্র ফিকির হল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কি ভাবে দু'টুকরো রুটি আর একটা পেঁয়াজ সংগ্রহ করবে। পেটের কাছে আবার পলিটিকস্?

নীরবে মাথা নাড়লাম। আত্রী আবার বললেন, এত দুঃখ হয় আমার এই দেশটার জন্যে। এই 'গরীবীর' জন্য এরা কি না করে—খুন-জখম, রাহাজানি, ডাকাতী, বেশ্যাবৃত্তি সব। শ্রীনগরে যান, দেখবেন গণিকাবৃত্তি কি ভাবে ছেয়ে আছে। সরকারী স্ট্যাটিসটিকস্ হল শতকরা পঞ্চান্ন জন ভি-ডিতে ভুগছে। এই দারিদ্রের কাছে এদের সতীত্ব, এথিকস, নাজীমুদ্দীন, আব্দুল্লাহ্, নেহরু সব বিলাস, সব বেকার চিন্তা। যে সরকারই আসুক, এরা জানে, এদের বাপ দাদারা যে ভাবে দিন কাটিয়েছে, এদের ভাগ্যেও তাই আছে। এরা কি আর মানুষ? আত্রীর কণ্ঠে চরম হতাশা ফুটে উঠল।

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, এ সব হল অশিক্ষার জন্যে। এখন স্কুল কলেজ সব হচ্ছে। পাবলিক এজুকেটেড হয়ে উঠলেই সব সমস্যা হালকা হয়ে যাবে।

বেশ বলেছেন, আত্রী ব্যঙ্গ করে উঠলেন,—পাবলিক বলতে তো প্রায় সবই গরীব অশিক্ষিত মুসলমান। তাদের মধ্যে যে কয়জন একটু লেখাপড়া জানে, তারা প্রায় সবাই শেখ্ সাহেবের চেলা। তার উপর 'মাস্ এজুকেশন্' হলে তো আর কথাই নেই। চাকরী তো আর পাচ্ছে না, আবার লেখাপড়া শিখে চাষবাসও করবে না। ফলে সব কটা মিলে করবে পলিটিকস আর আমাদের ঘরবাড়ী ছাড়া করবে।

কোনও উত্তর দেবার ছিল না। আত্রী আরও অনেক কথা

বলেছিলেন। আজ এতদিন পর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি তাঁর অধিকাংশ ভবিষ্যদ্‌বাণীই ফলে গেছে।

কাশ্মীরের বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠল। মহারাজা ডুবে থাকতেন বিলাসব্যসনে। দুর্ভাগা প্রজারা মরল কি বাঁচল, সে চিন্তা তিনি কোন দিন করেন নি। তার উপর শনিগ্রহ জুটলেন প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক। মধ্যযুগীয় অত্যাচারে সারা জম্মু ও কাশ্মীরে হাহাকার উঠল। কেউ শোনবার ছিল না। সে হাহাকার মহারাজার কানে পৌঁছলনা প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহে। চাপা পড়ল বিদেশিনী নর্তকীর চপল নূপুর ঝঙ্কারে।

কিন্তু জাতীর ভাগ্য এগিয়ে চলে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে। ইতিহাসের পথ বন্ধুর, বঙ্কিম হলেও অনিয়মিত নয়। এই বছরের পর বছর ধরে জমে ওঠা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম মাথা তুলে দাঁড়াল এক তরুণ যুবক। ভারতে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলেছে স্বাধীনতার আন্দোলন।

সেদিনকার সেই অজানা অখ্যাতনামা যুবকের জীবন হয়তো কাটতো কোনও এক পাহাড়ের শান্ত ছায়ায়। কাশ্মীরের ভাগ্য হয়তো থেকে যেত চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারে। কিন্তু তা হল না।

উচ্চশিক্ষার সাথে সে কাশ্মীরের অনাঘ্রাত পুষ্পে নিয়ে এলো মুসলিম লীগ্-এর কমুনালইজম্-এর বিষ। অসামান্য প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ করে তুলল অশিক্ষিত দরিদ্র কাশ্মীরীদের। কাশ্মীরে জন্ম নিল মুসলীম কনফারেন্স।

শ্রীনগরে হরিপর্বতের রাজদরবারে তখন রাজ্যের সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে চলেছে রাজ অনুগ্রহলাভের রেষারেষি। পণ্ডিত কাকের একটি কথায় কারও খসে পড়ে মাথা, কারও মাথা যায় ঘুড়ে

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। প্রজাদের মধ্যে হাহাকার। তারা অধিকাংশই মুসলমান। শুধু 'দোয়া' মানত্ করে খুদার, আর যোগায় ট্যাক্স্। ক্রমে সে হাহাকার, সেই যুবকের নেতৃত্বে কঠিন বজ্রের রূপ নিল। আর প্রমাণ করল মুসলীম কনফারেন্স নামের সার্থকতা।

তারপর সে এক শুভদিন। নেহরু এবং কংগ্রেসের স্পর্শ এবং মহাত্মাজীর আশীর্বাদ পেল সেই যুবক। চোখের সামনে থেকে অন্ধকার পর্দা সরে গেল। বুঝলে রাজ্যের অত্যাচারিত মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী হিন্দুরা নয়, দায়ী হল হরিপর্বতের ওই অভিশপ্ত সিংহাসন। মুসলীম কনফারেন্স তার আইডিয়াল বদলালো। নাম পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হল ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে। দাবী উঠল—মহারাজার অত্যাচার বন্ধ হোক।

—শের্-এ কাশ্মীর্ জিন্দাবাদ্।

অখ্যাতনামা সেই যুবকের জয়গান উঠল পাহাড়ে পাহাড়ে!

তারপর এলো ১৯৪৭ সাল। ব্রিটিশ সরকার সমস্ত সামন্ত রাজাদের দায়মুক্ত করে ভারত ত্যাগ করল। পণ্ডিত কাক এক অশুভক্ষণে পরামর্শ দিলেন মহারাজা হরি সিংকে---আমরা তো এখন স্বাধীন। মহারাজা হরি সিং তো একজন স্বাধীন নৃপতি।

কাকের বাক্য ছিল মহারাজার কাছে বেদবাক্য। তার উপর এ অচিন্ত্যনীয় প্রলোভন। বহুদিনকার সযত্নপোষিত স্বপ্ন বুঝি আজ সফল হল। সেই মুঘল আমলে কাশ্মীর যে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, আজ দৈব গতিকে সেই স্বাধীনতা নিজে থেকেই প্রাসাদ দুয়ারে উপস্থিত। মহারাজা হরি সিং হয়তো ভাবলেন, আজ তিনি ব্রিটেন, জাপান এবং অন্যান্য স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে একাসনে বসবার স্বীকৃতি লাভ করলেন। পণ্ডিত কাক ভাবলেন স্যর্ ক্লিমেণ্ট এটলী আর তিনি আজ একই রেখায়। বিরাট রাজদরবারে চাঞ্চল্য

পড়ে গেল। রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেল কে কত খোসামোদ করতে পারে তার শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার।

রাতের মধুর স্মৃতি বুঝি স্বপ্নের মতো তখনও লেগে ছিল তাঁদের চোখে। এমন সময় বিদ্যুৎ গতিতে খবর এলো, সীমান্তের অধিবাসীরা আক্রমণ করেছে কাশ্মীর; আর তাদের সঙ্গে আছে নবগঠিত পাকিস্তান আর্মির অজস্র রেজিমেণ্ট।

চিন্তিত মুখে তলব পড়ল প্রধানমন্ত্রীর। আলোচনা চলল বন্ধ ঘরে। পণ্ডিত কাক বললেন, কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। মহারাজা নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। গুজব বলে, পণ্ডিত কাক জনাব জিন্নাহ্‌র সঙ্গে একটা আপোষ রফার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একদিকে পাক কর্ণধারের আশ্বাস অন্যদিকে পাক ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণ। শেষ রক্ষা আর হল না। এক এক করে সব বেদখল হতে হতে আক্রমণকারীরা যখন শ্রীনগরের দরজায় এসে গেছে, তখন মহারাজার ঘুম ভাঙ্গলো। বুঝলেন, পণ্ডিত কাক তাঁকে সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। আর দেরী নয়। তড়িৎ গতিতে সই করে দিলেন ইন্‌সট্রুমেণ্ট অফ্ এক্সেশন্ এ।

ভাগ্যের চাকা আর একটু ঘুরলো। শের্-এ কাশ্মীর্ হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের ওজীর এ আজম্, শেখ্ মুহম্মদ্ আব্দুল্লাহ্।

আত্রী অবশ্য বলেছিলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স তো সেদিনের মশাই। চোখের ওপর নতুন জামা পড়ল। আগে তো ভারতের মুসলীম লীগ আর কাশ্মীরের মুসলীম কনফারেন্স দুই-ই ছিল এক। দুই-এরই নাড়া বাঁধা ছিল 'টু-নেশান্ থিয়োরী' এবং হিন্দু তাড়াও নীতিতে। তবে হ্যাঁ, শেখ্ সাহেব জিন্নাহ্ সাহেবের উপর টেক্কা মারলেন রাতারাতি ভোল বদলে। আমার মনে হয়, এর উদ্দেশ্য

হল স্বাধীন, সলতনত্ এ কাশ্মীরের ওজীর এ আজম্ হওয়া। দেখা যাক কি হয়।

কোনও রকম রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করা আমার নিষিদ্ধ। তাই কথা না বাড়িয়ে বললাম, বাদ দিন এসব সিরিয়স্ ব্যাপার। তার চেয়ে অন্য কথা বলুন, যা বলে আপনি আনন্দ পাবেন—শুনে আমি।

এক মিনিটে আত্রী সব ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, ঠিক হ্যায়। আচ্ছা একটা মজার কথা শুনুন। সংস্কৃত থেকেই যে কাশ্মীরী ভাষা এসেছে, তার জবরদস্ত্ প্রমাণ জোগাড় করেছি একটা। সংস্কৃতে 'কুত্র গচ্ছসি', আর আমরা বলি 'কুৎগশ্'। কি বলেন? আত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

আমিও হাসলাম, কিন্তু অন্য কারণে। এই লোকটিকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না। সময় সময় হয়ে পড়েন একেবারে ছেলেমানুষ, তারপরই হঠাৎ গম্ভীর। এ যেন হিমালয়, এই মেঘ—এই সূর্য। এই সিরিয়স্—পরক্ষণেই হিউমারাস। কি জানি, হয়তো কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্যই এই। নতুবা রাজনীতির খড়্গ মাথার উপর উদ্যত দেখেও, এদের জীবনে এত আনন্দ, এত গান আসে কোথা থেকে। কেমন করে এরা পাগল হয়ে যায় বসন্ত উৎসবের দিনে।

কিন্তু এগুলো ছিল আত্রীর বহিরাবরণ। প্রৌঢ়, অবিবাহিত, শঙ্করলাল আত্রী যে নিজেকে এক কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন, সে কথা যেদিন জানতে পারলাম, সেদিন আমার প্লুঞ্চ ত্যাগ করবার পরোয়ানা এসে গেছে। সেই খবর দেবার জন্যই সেদিন বিকেলে আবার গিয়ে হাজির হয়েছিলাম তাঁর বাসায়।

আত্রী একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন, সামনের পাহাড়টার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে। এত দিনের মধ্যে আত্রীকে এমন অবস্থায় কোনদিন দেখিনি। এ যেন একটি

প্রকৃত পেন্‌সিভ্‌ মুড্‌। অন্যান্য দিনেব মতো সোরগোল করে অভ্যর্থনা জানালেন না সেদিন।

বারান্দার নীচেই একটা মাঝারী গোছের মাঠ। পুঞ্চের উঁচু নীচু শরীরের মধ্যে একমাত্র সমতল প্রান্তব। তারপরেই খাড়া উঠে গেছে একটা পাহাড়, মেঘের কোল ছুঁয়ে। এক পাশ দিয়ে পাহাড় বেয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পুঞ্চ বাওলপিণ্ডী রোড। দুধারে তার পাইন আর পপ্‌লারের সারি।

শঙ্করলাল শুধু একটু মৃদু হেসে পাশের চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকাব নেমে এলো আমাদের নিস্তব্ধতার মধ্যে। আত্রীর ভাবান্তবে সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তবুও সে ভাব চেপে রেখে বললাম,—কাল চললাম আমি, আত্রী সাহেব। ট্রান্সফারড্‌ টু রাজৌরী।

আত্রীর দিক থেকে কোনও উত্তর পেলাম না।

একেই পুঞ্চ অত্যন্ত বেশী কোমল, অত্যধিক কমনীয়। তার উপর, সেদিন উঠল পূর্ণিমার চাঁদ সারা আকাশে রংয়ের বন্যা ছড়িয়ে। ঝিক্‌ মিক্‌ করে উঠল বরফের পাতগুলো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। এরকম উন্মত্ত পূর্ণিমা আমি আর দেখিনি। আমারও মনের উপর কেমন এক বিষণ্ণতার পর্দা নেমে এলো। হঠাৎ আত্রী বললেন, তা হলে চললেন আপনি? আমার জিন্দগী আবার সেই আগের মতো—পাহাড় আর পাইন।

এতক্ষণে একটু কথা বলবার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম। বললাম, একটা কথা হঠাৎ মনে হল। আপনার এখানে কোনও সোসাইটি নেই?

আত্রী হাসলেন। বড় দুঃখের হাসি মনে হল। বললেন, আই এ্যাম্‌ এলোন সাব্‌—একেবারে একা। মনে হল আরও কিছু বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। হঠাৎ খেয়ালের বশে একটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ কাজ করে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আত্রী সাহেব্‌, আপনি

এখনও ব্যাচলর। যাদ অপরাধ না নেন, তবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—কেন? আপনাদের সমাজে তো এটা আন্ ইউজুয়াল।

আত্রীর মধ্যে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, এতে আর দোষের কি আছে? তার উপর আপনি হলেন আমার দোস্ত্। আপনার জন্যে তো 'সর্ এ তস্লীম্ খম্ হ্যায়, জো মজাজে য়্যার্ মে আয়ে'—আমার এই মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত, এ সবই আপনার কাছে দোস্তীতে বাধা। আমার পরিচিত আত্রী একবার একটু উঁকি দিয়েই যেন পরক্ষণে আবার আত্মগোপন করলেন।

হুড়মুড় করে এক মুঠো বাতাস আছড়ে পড়ল বারান্দার উপর। হিমালয়ের এ এক বৈশিষ্ট্য। আবহাওয়া ভালো থাকলে সন্ধ্যা থেকেই একটা বাতাস ওঠে। সামনের মাঠটার এক কোণে একটা শামিয়ানার নীচে কয়েকটা হ্যাজাক্ অনেকক্ষণ থেকে জ্বলছিল। বেশ ভীড় জমে উঠেছে। গজলের মহ্ফীল্ বসেছে। বাতাসের সঙ্গে সেই দিক থেকে ভেসে এলো একটি সুরেলা কণ্ঠ—'লৌট্ লৌট্ কে আতা হুঁ মৈঁ, জা জা কে মঞ্জিল কে করীব্'। একবার, দুবার, তিনবার ঘুরে ফিরে গাইছে গায়ক। চমকে উঠলাম। কোথায় শুনেছি এ লাইন? হঠাৎ মনে পড়ল, সোহল বলেছিলেন ব্যঙ্গ করে।

আত্রী যেন জেগে উঠলেন। বললেন, যাইয়েগা?

উঠতে ইচ্ছা করছিল না। বললাম, না, এখান থেকেই শোনা যাক।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আত্রী বললেন, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না, আমি কেন এখনও বিয়ে করি নি। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমার অবস্থাও যে ওই গানের মতোই, 'লৌট্ লৌট্ কে আতা হুঁ মৈঁ জা জা কে মঞ্জিল কে করীব্'।

আশ্চর্য লাগল, জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আত্রী যেন হঠাৎ মুখর হয়ে উঠলেন, আপনি কখনও প্যার্ করেছেন ? কখনও, জীবনের কোনও অসতর্ক মুহূর্তে কি মুহব্বত করেছেন কোনও মেয়ের সাথে, যার চোখ ডাল্ লেকের মতো নির্মল, জুল্‌ফে—চুল, নাগীন্ লেকের মতো গহন, গাল মেওয়ার মতো রঙীন, দিল্ এই পাহাড়ের মতো মহিমান্বিত ?

আত্রীর উপমার বাহারে অজান্তেই হেসে ফেলেছিলাম। আত্রী একটু আহত হয়ে বললেন, আপ্ হঁস্ রহেঁ হ্যায় ? প্রেম করাটা হাসির জিনিব নয় দোস্ত। আপনি যদি প্রেম করে থাকতেন, আর সে প্রেমে যদি জ্বালা থাকতো, তবে হাসতেন না।

তমিস্রার শেষ কথাগুলো যেন ব্যঙ্গ করে উঠল আমাকে ; নতুবা সেই অদ্ভুত নরম সন্ধ্যায় আত্রীর মনে দুঃখ দিতাম না। বললাম, প্রেমে পড়েছি কিনা সেটা অবান্তর। কিন্তু যেটা অনুভব করেছি, তা হল এই যে, প্রেয়সীদের বিশ্বাস করা হল, নিজের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা।

আত্রী ভয়ানক আশ্চর্য হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—মানে ? উত্তর দিলাম, মানে এর একটিই। প্রেম, প্যার, মুহব্বত, লভ্ সব বানানো কথা, মানুষ ঠকাবার মন্ত্র। নারীর মন নিয়ে বহু মনো-বিজ্ঞানী, লেখক, কবি লিখেছেন অনেক কিছু। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলেছিলেন স্ত্রী-চরিত্র নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞাত। আধুনিক লেখকদের তো কারবারই ওই। কিন্তু আমি জেনেছি, মেয়েরা যা চায় তা প্রেম নয় বা মন নয়—সম্মান এবং প্রতিপত্তি। অর্থ আর অলঙ্কার।

আত্রী সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, বেশ লাগছে আপনার কথাগুলো। তারপর ?

বন্ধুর ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হলাম, বললাম, দেখুন ব্যঙ্গ করা অথবা সত্যকে অস্বীকার করা আপনার অভিরুচি। কিন্তু একটা কথার জবাব দিতে পারেন ? সুদীর্ঘকাল ভালবাসার পরও, বিবাহের পূর্বে

কেন নারী খোঁজ নেয় তার ভবিষ্যত স্বামীর আর্থিক যোগ্যতার? কেন কয়েকটা তুচ্ছ সংস্কারের অজুহাতে প্রেমিককে ঠেলে সরিয়ে দেয় ঘৃণাভরে? তার ঘৃণাটাই সত্য, না পূর্বের ভালবাসাটা সত্য?

আত্রী একটু হেসে বললেন, বুঝেছি, আপনার হৃদয়েও আছে ক্ষত। কিন্তু একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি একজন দুর্ভাগা। নারীর সাক্ষাৎ পান নি, পেয়েছেন রঙ্গিনীর। আচ্ছা আপনি তো প্রেমকেই অস্বীকার করছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ভগবান মানেন?

বললাম, মানি তবে আপনাদের ভগবান নন—যিনি সামান্য পূজোর ঘুষেই মানুষের সব মঙ্গল করেন। আমি বিশ্বাস করি এমন এক ভগবানকে, যিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সব জায়গায়; যার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আমাদের আমিত্ব, আমাদের অনুভব, দৃষ্টি চিন্তা ও কল্পনার অভ্যন্তরের এবং বাইরের প্রতিটি বস্তু। এ শুধু একটা শক্তি, এর কোন ইচ্ছা নেই, আকার নেই, প্রকার নেই।

আত্রী বললেন, বেশ, এতেই হবে। বোঝা গেল আপনি ভগবানের নামে ব্যবসাটাকে ঘৃণা করেন। এ বিষয়ে আমিও একমত। কিন্তু আপনার থিয়োরীর দ্বিতীয় অংশের সাথে আমি একমত নই। যাই হোক, আপনি যেটা মানেন তাকে কখনও অনুভব করেছেন?

স্বীকার করলাম, করিনি। কিন্তু তারাই কি করেছে, যারা ভগবানকে মানুষের সব ভাল-মন্দের কর্তার বলে প্রচার করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে, কোনও পরিশ্রম না করে স্রেফ লোক ঠকিয়ে?

কি জানি তারা অনুভব করেছে কিনা, আত্রী উত্তর দিলেন: —তবে আমি এইটুকু জানি যে, তাঁর অনুভব হল আনন্দময়। আর আনন্দ লাভের সব চেয়ে সরল এবং সহজ পন্থা হল প্রেম। আমার বিশ্বাস, আজ যে প্রেম আমার মনে জেগেছে এক বিশেষ নারীর

জন্যে, তা যদি প্রকৃত হয়, তবে কাল তা হবে সকলের জন্যে। তারপর দেখব আমি এক পরমানন্দের মধ্যে বাস করছি।

আমি হাসলাম। এবার প্রকাশ্যেই। জিজ্ঞাসা করলাম, তাই যদি হবে, তবে প্রেমের পাত্রটি শুধু মেয়েই কেন হবে, পুরুষও তো হতে পারে?

আত্রী তাকালেন আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। সে চোখে তিরস্কার ছিল কিনা জানি না। বললেন, এও সেই সহজ বলেই। নারী-পুরুষের সহজাত আকর্ষণের মধ্য দিয়েই প্রেম সহজে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে এই জন্যেই। এটাই তো হল প্রথম ধাপ।

চাঁদের থম-থমে আলোর মধ্যে চারদিক কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আত্রী আবার বললেন, আমি কিন্তু ভালবেসেছি সাব্। সেরকম মুহব্বত বোধহয় মজনুও করে নি লয়লাকে। আর তা হল—এই, আত্রী একগুচ্ছ নার্গিসের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন।—তাকেও আমি নাম দিয়েছিলাম নার্গিস্। জানেন বোধহয়, নার্গিস্ হল আমাদের ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার এর মতো। আমাদের জীবনের, জম্মু প্রদেশের এই ব্যারেন ল্যাণ্ডের সব রোমান্সকে এক জায়গায় জড়ো করলে যা হয়, তা হল নার্গিস।

আত্রীর বারান্দার নীচে সার-বন্দী নার্গিসের গাছগুলো এতদিন এভাবে লক্ষ্য করি নি। চাঁদের আলোর নীচে রজনীগন্ধার মতো ডাঁটা ভর্তি হলুদ রংয়ের ফুলগুলো থরে থরে ফুটে আছে। তীব্র উগ্র গন্ধে চার দিক ভরপুর।

আত্রী ধীর স্বরে বললেন, ওই যে পথ চলে গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে রাওলপিণ্ডির দিকে, ওরই উপর, কিছুদূরে একটা গ্রামে ছিল আমার বাড়ী। ওখানকার হাকিম সাহেবকে চিনত না এমন লোক এখনও বোধহয় পুঞ্চে নেই। যাক সে কথা। নার্গিস্ ছিল তারই মেয়ে। যে চশ্মার ধারে প্রথম আমরা মুহব্বতকে জেনেছিলাম,

তা আজ পাকিস্তানের দখলে। সে গ্রামও আর নেই। আত্রী সাহেব সেই পথের দিকে চেয়ে যেন দূর অতীতের ঘটনাগুলোকে মনের হাতে স্পর্শ করে যাচ্ছিলেন।—তারপর বিয়ে যখন ঠিক, হাকিম সাহেব যখন হয়েছেন প্রস্তুত তখন কাশ্মীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদার শয়তানের দল। পুঞ্চের যত দামী দামী জিনিষ যা লুট হল তার মধ্যে সবচেয়ে কিম্মত্‌দার ছিল আমার নার্গিস্ আর আমার দিল্।

নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলাম। আত্রীর হৃদয়ের গ্রন্থি ক্রমশঃ খুলে যাচ্ছিল আমার কাছে। তাঁর অত প্রাণ খোলা হাসি, অত ছেলে মানুষী, অত গল্প, সবই হল এই দুঃখ ভোলবার একটা ছলনা।

হাকিম সাহেব প্রাণে বেচে পালিয়ে এলেন পুঞ্চে। ওরা কিন্তু নার্গিস্‌কেও আটকে রাখতে পারল না। প্রায় পনের দিন পর একদিন রাত্রের অন্ধকারে নার্গিস্‌ও পালিয়ে এলো পুঞ্চে, পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে। আত্রী চুপ করলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

হাঁ, তারপর এক সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণা, এক বেরহম্ দর্দ্-এর মধ্যে আমার দিন কাটতে লাগল। নার্গিসের দেহ ওরা নিংড়ে নিয়েছিল। তাকে বিয়ে করলে আমায় হতে হবে সমাজচ্যুত। কি করব? কিন্তু আমার প্যার ছিল পবিত্র, জিত হল তারই। গুলিগোলার হাত থেকে পুঞ্চ যখন রেহাই পেল, পাকিস্তানীরা পালাল আপনাদের দয়ায়, তখন একদিন বললাম নার্গিস্‌কে—এবার তো সব হাঙ্গামা চুকে গেছে। বলি এবার হাকিম সাহেবকে?

আত্রী একটা সিগারেট ধরালেন। হ্যা তাকে বললাম। কিন্তু কি জবাব দিল জানেন? আত্রী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জবাব দিল—আমার এ শরীর হয়ে গেছে না-পাক্, অপবিত্র। এতো আমি আর তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না। সে যে হবে মুহব্বত এর অপমান। তার থেকে, আমরা দূর থেকেই ভালবেসে যাই।

দেহের মিলন নাই বা হল, কিন্তু আমার এই না-পাক্ দেহ তোমাকে দিয়ে আত্মার মিলনকে ব্যর্থ করতে পারব না।

অনেক বোঝালাম ওকে। কোন কথা শুনল না। শেষে একদিন শুনলাম হাকিম সাহেব চলে গেছেন নৌসেরা। বুঝলাম, আমার কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্যই নার্গিস্ এই পথ বেছে নিল। হাকিম সাহেব এখনও সেইখানেই প্র্যাক্টিস্ করেন।

অবাক লাগছিল। মেয়েজাতটাই কি একই রকম সব জায়গায়? সেই একই সেন্টিমেণ্ট বাংলায় আর কাশ্মীরে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তারপর নৌসেরা যান নি?

না, আত্রীর কণ্ঠে যেন এক অদ্ভুত আনন্দের ছোঁয়াচ পেলাম। প্রথমে কষ্ট হত, দুঃখ হত অসহ্য। কিন্তু এখন আর হয় না। প্রথমে ছিল দেহের আকর্ষণ। এখন তা পুড়ে পুড়ে হয়ে গেছে দেহাতীত। এখন মনে হয়, নার্গিস্‌কে যদি পেতাম তবে ভাল-বাসার এ আনন্দ আমার কাছে অপরিচিতই থেকে যেত। তাকে না পেয়েও আমার সারা অন্তর আজ ভরাট। আমি জানি, এই বিরাট দুনিয়ায় একটি হৃদয় আছে, যার একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান হলাম আমি। আই এ্যাম্ কম্প্লিট ট্-ডে সাব। আজ আমি দিল্ ঔর্ জীগর্ দিয়ে নার্গিস্‌কে আমার মধ্যে অনুভব করি সব সময়।

একটু থেমে মৃদু হেসে আবার বললেন, আপনি হয় তো মানবেন না, কিন্তু আমার কাছে চরম এবং পরম সত্য হল নার্গিসের দেহ না পাওয়া নয়, তার হৃদয় পাওয়া—তার হৃদয়ের দেবতাকে পাওয়া। সেই প্রেমের মঞ্জিলে বার বার যাবার আনন্দটাই আমার কাছে সব, ওখানে পৌছানটা নয়। তাই এই আনন্দের স্পর্শেই আমার মন গেয়ে ওঠে, ক্যা মুহব্বত নাম হ্যায় প্যারে রসুলাল্লাহ্ কা। সেই পরমানন্দময় ভগবানকে পাবার আনন্দ যে কি, তা আমি জানিনা, কিন্তু এই প্রেমের আনন্দ—তাকে যে আমি রোজ, প্রতিক্ষণ আস্বাদ করি। সে কি তাই নয়?

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিই নি। ফেরত পথে আমার মন চিন্তার জাল বুনে চলেছিল। কে সত্য? সোহল না আত্রী? সোহলের মত অনুসারে আত্রী সাহেব একজন পয়লা নম্বরের ইডিয়ট। কিন্তু আত্রীর যে আনন্দ, সেটা যে মিথ্যাই, তাই বা বলি কী করে। সেই দিন প্রথম আমার মনে একটি দ্বিধার বিন্দু পড়ল। শঙ্করলাল আত্রীর অতো হাসি, অতো গান—এ কি কেবল দুঃখ ভোলবার ছলনা নয়? সে কি সত্যই আন্তরিক আনন্দের প্রকাশ?

তা যদি হয়, তবে স্বীকার করছি, এ জিনিস আমার কাছে এখনও অজ্ঞাত।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পুঞ্চ ত্যাগ করলাম। সে সময়, প্রচণ্ড বর্ষণের শেষে সারা জম্মু ও কাশ্মীরে দেখা দিয়েছে বসন্ত—দৃপ্ত ভঙ্গীমায়। পত্র-বিহীন শীর্ণ-শাখায় দেখা দিয়েছে অসংখ্য কোরক। পুঞ্চ নদীর তীব্রতা মন্দীভূত হয়েছে। পুঞ্জীভূত তুষারের মধ্যে আবার জেগে উঠেছে পাইন আর পাথরের কালো কালো বিন্দু। পুঞ্চের যে পর্বতমালা অতিপরিচিত হয়ে উঠেছিল আমার কাছে, যে বিষাদ করুণ পাইন শাখাগুলি হয়ে উঠেছিল অতি আপনার জন, তাদের কাছে বিদায় নিলাম বিষণ্ণ মনে। বন্ধু আত্রীর চোখ সজল হয়ে উঠল। যে পথ দিয়ে একদিন পুঞ্চে এসেছিলাম, সেই পথেই আবার ত্যাগ করলাম পুঞ্চ।

জীপ স্টার্ট নিতেই ভেঙ্কট স্বামী বিকশিত হাস্যে বললেন, নাউ উই উড্ হ্যাভ্ এ জলি গুড্ লাইফ্—আনন্দে কাটান যাবে। কি বল ওল্ড বয়?

পুঞ্চের তুলনায় রাজৌরী অনেক উগ্র। পুঞ্চের যে সবুজ স্নিগ্ধ আবরণ আমার বাঙালী মনকে দ্রবীভূত করে ফেলত, তার চিহ্নমাত্রও

ছিল না রাজৌরীতে। কঠিন, রুক্ষ, তৃণ-বৃক্ষহীন পাহাড়গুলি প্রচণ্ড সূর্যাতপে ঝলসে গেছে। চোখ জ্বালা করে ওঠে। পাইনগুলো ফ্যাকাশে, শ্রীহীন। পূর্বে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে একের পর এক চলে গেছে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর নানা শাখাপ্রশাখা। উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন ধ্যানমৌন পীরপাঞ্জাল। তার তলা থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে একটা নদী। রাজৌরীর একপাশ ঘিরে একটা বাঁক নিয়ে, আমার তাঁবুর কোল ঘেঁষে নেমে গেছে কোন অজানার দিকে। তার উপরে পাহাড়ের মাথায় লস্ট সিটি—রাজৌরী শহর। পোড়ো আর ভাঙ্গা বাড়ী এবং পাথর আর কাঠের স্তূপ।

দুর্বাসা-দৃষ্টিতে ঝলসানো এই রাজৌরীতে যে-দিন বসন্ত এলো পূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে, সে-দিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারদিকে নানা বিচিত্রবর্ণের পুষ্পসম্ভার নিয়ে তাকে বরণ করল অসংখ্য পত্র-বিহীন বৃক্ষ। পাথরের আড়াল থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দলে দলে নার্গিস্ তাদের হলুদ রং-এর শোভা নিয়ে; রক্তরাগে জেগে উঠল বেদানার বন, শঙ্খশুভ্র বেশ-বাসে করুণ নয়নে এদিকে ওদিকে উঁকি দিল লিলির দল। রং-এ রং-এ ছেয়ে গেল রাজৌরীর আকাশ-বাতাস। প্রোষিতভর্তৃকার মতো বিরহ-বেদনায় ক্ষীণতনু হল নদিটি। নয়নমনোহর পীরপাঞ্জালের বরফে ফুটে উঠল কালো কালো রেখা। কিন্তু রুক্ষ দেহ এবং শুষ্ক, উন্মাদ দৃষ্টি নিয়ে অপরিবর্তিত হয়ে রইল আমার তাঁবুর ঠিক সামনে, নদীর ওপারের পাহাড়টি। বসন্ত তাকে জাগাতে পারল না। আর, শোনা গেল না কোনও কুহুরব। বসন্তের দেশে কোকিল রইল অনুপস্থিত।

সৈনিক হলেও মানুষের মন যার আছে, সে সাড়া না দিয়ে পারে না এই উন্মত্ত প্রকৃতির ডাকে। আমাদের হেড কোয়ার্টারের মন্দিরে তাই এক সন্ধ্যায় শোনা গেল হারমোনিয়াম আর তবলার লহরা। একটি গম্ভীর মিষ্টি সুরও ধ্বনিত হল। সে সুর বসন্ত-এর।

শেক্স্‌পীয়র্ নাকি বলেছিলেন, গান যে ভাল না বাসে, সে

মানুষ খুন করতে পারে। এতখানি চরম মত দিয়ে বিচার না করেও বলতে পারি, আমি খুনেদের দলে নই। অনেক রাত আমার কেটেছে গানের মজলিসে। প্রকৃত গায়কের কণ্ঠে সুর যে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা বহুবার অনুভব করেছি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণের বেড়াজালে আটক না পড়েও। সেদিনের সে বসন্তরাগের আলাপ আমাকে আচ্ছন্নের মতো টেনে নিয়ে গেল সেই মন্দির চত্বরে। এবং সেই সন্ধ্যা থেকেই আমি যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম।

কাঁধের উপর ছড়ানো একগোছা সাদা ধপধপে চুল এক গৌরবর্ণ বৃদ্ধ চোখ বুঁজে আলাপ করে যাচ্ছেন। মুখখানাতে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। সামনে একজন সৈনিক তবলাটা নিয়ে অনর্থক উৎপাত করছে। বৃদ্ধের সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। এক কোণে রাম-সীতার এবং কৃষ্ণের বড় বড় দুখানা বাঁধান ছবি। ধূপের গন্ধে সারা তাবু ভরে গেছে। নিঃশব্দে বসে পড়লাম এক পাশে।

ভুলে গেলাম আমি কোথায় আছি। সময়ের সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছি সুরের নৌকোয়। হঠাৎ কাঁধে একটা স্পর্শ পেয়ে সম্বিত ফিরে পেলাম। চারদিকে চেয়ে দেখলাম, সবাই চলে গেছে। বৃদ্ধ সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে আছেন, ডাকছেন, বাবুজী।

লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ বললেন, এবার তো মন্দির বন্ধ হবে। রাত হয়েছে।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পণ্ডিতজী মন্দিরের দরজাটা টেনে দিলেন। আপনা থেকেই হাতদুটো আমার উঠে গেল। নমস্কার করে নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়ালাম।

শুনিয়ে বাবুজী, কোমল স্বরে বৃদ্ধ ডাক দিলেন। ফিরে দাঁড়াতে বললেন, ফির কল্ আইয়েগা।

তাঁবুতে ফিরে এলাম, কিন্তু তখনও সে সুর আমার সমস্ত অন্তরে আলোড়ন তুলে যাচ্ছে। গান শুনেছি অনেক, ধন্য হয়েছি অনেক

বড় বড় গুণীর সঙ্গলাভে। কিন্তু রাজৌরীতে, প্রকৃতির বন্য উদ্দাম বাসন্তিক মর্মরের মধ্যে, এই সাধারণ গায়কের সুর আমাকে সেদিন যেন সম্পূর্ণই বিহ্বল করে দিল। খাবার পড়ে রইল অবহেলায়। একখানা চেয়ার বার করে বাইরে বসে পড়লাম প্রকৃতির মধ্যে।

এরপব থেকে আমার একমাত্র প্রাত্যহিক চিন্তা হলো কখন সন্ধ্যা হবে। অধীর প্রতীক্ষার সময় পেরিয়ে আমার অভিষ্টক্ষণ এসে পড়ত এক সময়। আচ্ছন্নের মতো, এক দুর্বার আকর্ষণে হাজির হতাম মন্দিরে। তখনো হয়তো কেউ এসে পৌঁছয় নি। পণ্ডিতজী একটু হেসে ডেকে নিতেন ভিতরে। গানে গানে, সুরে সুরে আমার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

পণ্ডিতজী পেশাওয়রী হিন্দু-ব্রাহ্মণ। পূর্বজীবনে ছোটে গোলামআলী খানের কাছে সঙ্গীত শিক্ষাব সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারত বিভক্ত হবাব পব যখন ছেড়ে আসলেন তাঁব জন্মভূমি পেশাওয়র, তখন সেই সঙ্গীতই তাঁকে দিল অন্নেব সংস্থান। মনের খোবাক অবশ্য তাঁকে দিয়েছিল অনেক আগে থেকেই। একটু মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, স্ত্রী মারা যাবাব পর আমার জীবন যখন শূন্য হয়ে পড়ল, তখন এই গানই আমাকে বঁচিয়েছে বাবুজী। সে-ও গান ভালবাসত বড়।

উর্দুতে একটা কথা আছে—বয়স কখনও বন্ধুত্বের মধ্যে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে না যদি মন মিলে যায়। আমাদের তাই হল। পণ্ডিতজী প্রায়ই গল্প কবতেন তাঁর পেশাওয়রের, তাঁর স্ত্রীর। যাঁকে তিনি ভালবাসতেন নিজের থেকেও বেশী। সে-ই বেওয়াফা চলে গেল তাঁকে ছেড়ে। নিঃসন্তান পণ্ডিতজীর আর সময় কাটতো না। তানপুরাটা নিয়ে নিজের মনে গুন্ গুন্ করে যেতেন। তাবপর হয়তো প্রাণ খুলে গাইতেন গালীব-এর কোনও গজল। অপূর্ব শান্তি পেতেন। পাকিস্তান হবার পরও পেশাওয়র

তিনি ছাড়েন নি। কিন্তু যখন ইন্‌সানিয়ত্‌ আর রইল না সেখানে, তখন বাধ্য হয়ে চলে এলেন আগ্রায়। মহানুভব সরকার তাঁকে দিলেন চাকরী—সৈন্য-বিভাগে পূজারীর পদ। সেই চাকরীই তাঁকে টেনে আনল রাজৌরীতে। এখানে তবুও সান্ত্বনা তাঁর, এই পাহাড়গুলোই ছুঁয়ে আছে পেশাওয়রের পাহাড়কে, তাঁর প্রিয়ার মৃত্যুভূমিকে।

নিজের জন্মভূমি পেশাওয়রের প্রতি কখনও টান দেখলাম না পণ্ডিতজীর। আকর্ষণ দেখলাম স্ত্রীর মৃত্যুভূমি পেশাওয়রের প্রতি। মৃত্যুকে এত অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতে আর কাউকে দেখি নি এর আগে।

রাজৌরীর বাসিন্দাদের মধ্যে একজন বাঙালীও আছেন, এ খবর যেদিন পেলাম, সেদিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিলাম, কে বাঙালীকে ঘরকুণো বলেছে। তারপর যেদিন তাঁর সাথে পরিচয় হলো, সেদিন থেকে প্রবাসী বাঙালীর স্বজাতি-প্রীতি সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল।

নিজের দেশে বাঙালী যতই স্বার্থপর হোক, বিদেশে কিন্তু সে পরম স্বার্থত্যাগী। প্রবাসী বাঙালী আবার এ বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক।

সেদিন কি একটা উপলক্ষে ছুটী ছিল। ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করলেন। গৃহিণীর অনুপস্থিতিতেও যে তাঁর মতো ভোজন-রসিকের রসনা-তৃপ্তির কোন ব্যাঘাতই হয় না, তারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পেশ করলেন তিনি, দরবারী রান্নার মারফতে।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন একজন স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর কাছে শুনলাম বসন্ত উপেক্ষিত ওই পর্বতটির করুণ-কাহিনী, তার চূড়ার উপরের দুর্গটির ইতিহাস। সে কাহিনী সভ্য মানুষের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

কাশ্মীরে হানাদারী আক্রমণের মধ্য পর্যায়। ভোরের আজান তখনও ছড়ায় নি পাহাড়ে পাহাড়ে। উপজাতীয় হানাদারদের সাথে রাজৌরী শহরে প্রবেশ করল পাকিস্তান বাহিনী। বাধা দেবার কেউ ছিল না। নৌসেরার সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত। শ্রীনগরে মহারাজা হরি সিং-এর তখন ভাগ্য-পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে ইনস্ট্রুমেণ্ট্ অফ্ এক্সেশন্, অন্যদিকে ন্যাশনাল কনফারেন্স্। রাজৌরীর অধিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, ইসলামিক্ রাষ্ট্র পাকিস্তান তাদের কোনও ক্ষতি করবে না।

কিন্তু সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা অসার প্রমাণিত হল। প্রথমেই আরম্ভ হল লুট এবং হত্যা। হিন্দু-মুসলমান বাদ-বিচার রইল না। হোলি খেলা শুরু হল মানুষের রক্তে। রাজৌরীর পাথরের গলিগুলো লাল হয়ে উঠল। বাড়ী বাড়ী থেকে কঁকিয়ে উঠল নিঃসহায় মানুষের আকুল ক্রন্দন। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সে শব্দ আবার মরে গেল এক সময়। তারপর রাইফেল আর স্টেন্গানের পাহারায় মার্চ করিয়ে যুবতী মেয়েদের তারা নিয়ে গেল ওই দুর্গে। হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের আল্লাহ্ রসুল নিঃশব্দে উপেক্ষা করলেন এই বর্বরতা। সে রাতে শাহ্জাঁহার তৈরী দুর্গে বহুদিন পর জ্বলে উঠল পেট্রোম্যাক্স, বখরা হল লুটের মালের। সারারাত ধরে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কালী ঢালা হল।

এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে আমার চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে গিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম শুধু রাজৌরী এবং নৌসেরাতেই নয়, সারা জম্মু-কাশ্মীর জুড়েই চলেছিল এই নারকীয় লীলা।

এই কাহিনীই আমাকে আকর্ষণ করেছিল সেই পাহাড়ের প্রতি।

পাহাড়ের সারা শরীর মাইন আর বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। চূড়ার উপরে দুর্গ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে দেখলাম, সেই

রুক্ষ, ক্ষত-বিক্ষত, বীভৎস ঐতিহাসিক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র সবুজ গাছ আর তার একটা শীর্ণ শাখায় ফুটে আছে একগুচ্ছ লাল ফুল। কেন জানি না, মনে হল এইখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল রাজোবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, রক্তাপ্লুত দেহ-মঞ্জরী। মনে হল, এখনও কান পাতলে শোনা যাবে তাদের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

কেন জানি না, আর একটা কথাও যেন মনে হয়েছিল তখন, ---কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সব অসার বাক্য-বিন্যাস। কতগুলো দল-ছাড়া পাগলের প্রলাপ। পৃথিবীর একমাত্র ভাল্ হল বর্বরতম নিষ্ঠুরতা আর হত্যা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তির, যার অভিনয় এককালে হয়েছিল সোমনাথে, কাশীতে, দিল্লীতে।

বন্ধুর আহ্বানে চিন্তার সূতো ছিঁড়ে গেল। মন্থর পায়ে, ভারাক্রান্ত মনে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলাম। পাকিস্তানী এবং ভারতীয় ফৌজের হাত-বদলের ফলে, বিরাট, সুদৃঢ় পাথরের দুর্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভাঙ্গা দেওয়ালে কয়লা দিয়ে হিন্দী, উর্দু এবং ইংরেজীতে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের নাম লেখা দেখে এই অবস্থাতেও হাসি পেল। নামের স্থান পাশাপাশি হতে পারে, কিন্তু যত গোলমাল নামীকে নিয়েই!

পাহাড়ের ওপাশে দেখা যাচ্ছিল কতগুলো গ্রাম। পাথর এবং মাটি দিয়ে গাঁথা বাড়ীগুলো ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে বহুদূরে। চারপাশ ঘিরে সবুজ ক্ষেত। কেন জানি না, সেই দিকেই নেমে চললাম। তিনজনেই হয়তো একই চিন্তা করছিলাম।

ফাল্গুনের দুপুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের তেজ আমাদের ক্লান্ত করে দিল। আকণ্ঠ পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠল। পথে বাড়ী পাই, কিন্তু দূর থেকে সৈনিকের পোষাক দেখেই বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন বুঝলাম সাধারণের দৃষ্টিতে আজ

আমরা কতখানি ঘৃণ্য। আমরা অর্থে—সৈনিকেরা, যাদের বীভৎসতম পরিচয় ওরা পেয়েছিল হানাদার সৈনিকদের মধ্যে। পিপাসায় মৃতপ্রায় হলেও, জল দেবার মত কাউকে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বিনা অনুমতিতে একটা বাড়ীর উঠোনে ঢুকে পড়লাম।

লাল-নীল সালোয়ার আর ওড়নাগুলো চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে। এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন একটু পরে। কুঞ্চিত চোখে তাঁর পুঞ্জীভূত সন্দেহ।

মরিয়া হয়ে বললাম, পানী পিয়েঙ্গে।

বৃদ্ধ বোবার মতো তাকিয়ে রইলেন। বোধ হয় বুঝলেন না আমার ভাষা, অথবা বুঝেও বিশ্বাস করতে পারলেন না আমাদের। শেষে সোহল এগিয়ে এলেন। পাঞ্জাবীতে বুঝিয়ে বললেন আমাদের উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করলেন, তারপর নিঃশব্দে চলে গেলেন ভিতরে।

নিরাশ হয়ে যখন ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন এক ঘটী ঘোল আর একটা গ্লাস নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখ থেকে সন্দেহের ছায়া মিলিয়ে গেল। আলাপ জমে উঠল এক প্যাকেট সিগারেট দিতেই।

বিদায় নিয়ে ফেরবার সময়, আমি একটা টাকা গুঁজে দিলাম বৃদ্ধের হাতে, ঘোলের দাম বাবদ। সঙ্গে সঙ্গে মার-মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। সোহলের সাথে কথাবার্তা চলল খানিকক্ষণ। সোহল বললেন, বৃদ্ধা বলছেন, আমরা তাঁর বেটার মতো। ঘোলের দাম দিয়ে তাঁকে আমরা অপমান করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার আধুনিক শিক্ষিত মন লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে বললাম, মাতাজী, অপরাধ হয়েছে। হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধার মুখে।

প্রকৃতি যেমন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সারা জম্মু-কাশ্মীরে, সৌন্দর্য

যেমন পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে বনে পর্বতে, হৃদয় তেমনই বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এখানকার মানুষের মধ্যে, গ্রামে গ্রামে। তাকে পাবার জন্য শুধু চাই মনুষ্যত্ব, চাই মানুষের হৃদয়।

কৈদ্ মেঁ সৈয়াদ্ মুঝ্‌কো এক্ জমানা হোগয়া।
দিল্ মেরা তীরে সিতম্‌গর কা নিশানা হোগয়া॥

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম জলের মধ্যেই। ফেরত পথে পূর্ণিমার চাঁদের বন্যায় চারদিক প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। নদীর মধ্যে হাটু জলে দাঁড়িয়ে কানে এলো দূর থেকে ভেসে আসা গান। পণ্ডিতজীর গলা। আমার আর মেসে ফেরা হল না। তাড়াতাড়ি এ পারে এসে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম।

ছুটী উপলক্ষ্যে সবাই সেদিন উৎসবে মত্ত। মন্দিরের মধ্যে একলা পণ্ডিতজী প্রাণ ঢেলে গেয়ে চলেছেন--'কৈদ্ মেঁ সৈয়াদ্ মুঝ্‌কো এক্ জমানা হোগয়া'—এক্ জমানা, এক যুগ কেটে গেছে আমার এই কারার ভিতর। পণ্ডিতজী সমস্ত হৃদয়, সমস্ত সুর, সমস্ত মন-প্রাণ-দিয়ে অনুযোগ করছেন---আর তো পারি না। আর কতদিন? আর কত যুগ থাকতে হবে এই যন্ত্রণার কারাগারে, বে-দরদীর তীরের নিশানা হয়ে?

উত্তর দেবার কেউ ছিল না। আমি তাঁর মুগ্ধ শ্রোতা কিন্তু দরদী, মরমী নই। তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত দুঃখের অংশ নেবার আমি কেউ নই। তবুও মনে হল, এই বৃদ্ধের দুঃখের এতটুকু অংশও নিতে পারলে বড় আনন্দ পেতাম।

হঠাৎ গান থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন পণ্ডিতজী। ইসারায় বসতে বলে ঠাকুরের বেদীর সামনে গিয়ে বসে পড়লেন চোখ বুঁজে। নিশ্চল তাঁর দেহ, নিঃশব্দ সে মন্দির। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, অনেক দিন পর এলেন বাবুজী। বড় খুশী হলাম।

ধীরে ধীরে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বাজাতে লাগলেন আনমনে। তারপর হঠাৎ বললেন, আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এ দিনটা আমার কাছে বড় পবিত্র, বড় মধুর। এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের তিনটি ঘটনা। আজকের দিনেই আমার হাতে নাড়া বেঁধে ছিলেন আমার গুরুজী, আজকের দিনেই পেয়েছিলাম আমার জীবন-সঙ্গিনীকে, আর, আজকের দিনেই তাকে নিজের হাতে বিসর্জন দিয়েছিলাম পেশাওয়রে।

একটা করুণ অথচ মধুর হাসি ফুটে উঠল তাঁর কুঞ্চিত মুখে। তারপর গুন্ গুন্ করে আরম্ভ করলেন—

মস্ত নজরোঁ সে মুঝে দেখকে বর্বাদ্ ন কর্।
দাদ্খায়াঁকে লিয়ে আয়া হুঁ বেদাদ্ ন কর্॥
কত্ল্ কর্ ডাল্ মুঝে কয়েদ্ সে আজাদ্ ন কর্॥

সেই পূর্ণিমার সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর মুগ্ধ আবিষ্ট মূর্তি দেখে মনে হল যেন মৃত প্রিয়াকে তিনি চোখের সামনে দেখছেন আর আর্তনাদ করে উঠছে তাঁর অন্তর।--তোমার ওই মস্ত নজর্--মদিরময় আঁখি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বর্বাদ্ করো না--সর্বনাশ করো না। আমাকে কতল্ করে ফেলো, মেরে ফেলো, কিন্তু তোমার ভালবাসার বাধন থেকে—কয়েদ্ থেকে, আমাকে আজাদ্ করো না। সে মুক্তি আমার কাম্য নয়, আমি তা চাই না।

আমার মনে চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এলো। প্রেম, ভালবাসা, মানুষের এই সব দুবলতা নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথার কত জাল বুনেছেন কবিরা। আমার জীবনে আমি অনুভব করেছি এর অসারতাকে। কিন্তু আত্রীসাহেব, পণ্ডিতজী, সবাই যেন নিজের দিকে নির্দেশ করে আমার সে অনুভবকে ব্যঙ্গ করছেন।

তাই আমার মনের আকাশে বৈশাখী-মেঘ ঘনিয়ে এলো।

আর সেই সঙ্গে রাজৌরীর আকাশে-বাতাসে বর্ষার আগমন ঘোষণা করে, ঘিরে এলো মৌসুমী মেঘ। সেই মেঘের স্পর্শে অদূরের পীরপাঞ্জাল হয়ে উঠল গাঢ় নীল। সেই প্রগাঢ় নীলিমার ভিতর থেকে ফুটে উঠল এক ভীতিজনক অথচ তীব্র-আকর্ষণীয় চিত্ত-অস্থিরকারী অনুভূতি। সম্পূর্ণ পীরপাঞ্জাল যেন নিজেকে ঢেকে নিল এক অপার্থিব রহস্যের মধ্যে। আমি ভীত হয়ে পড়লাম।

মন আমার ভীতিগ্রস্ত হলেও, অন্তর কিন্তু আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠল। চিত্ত হয়ে উঠল অস্থির। প্রথম পরিচয়ের ভয় আর আনন্দের মধ্যে যেমন অবস্থা হয় প্রণয়ীযুগলের, কতকটা তেমনি। মনে হল, যেন পুরুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হচ্ছে প্রকৃতির। আমি বিস্মৃত হলাম নিজেকে। একটা অদম্য অপার প্রবণা এবং দুর্বার গতিবেগে আকুল হয়ে উঠলাম। কি চাই—কি যেন একটা হারাচ্ছি, কি যেন একটা ছুঁয়েও ছুঁতে পারছি না। শেষে যেন নিজের থেকেই আমার অন্তর আকুতি করে উঠল—'এবার আমারে লহ করুণা করে।' এই আকুল আত্মসমর্পণের মুহূর্তে আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সমস্ত হৃদয় এবং মন শুধু উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সেই অনুভূতির চরণে লুটিয়ে পড়বার জন্যে। প্রচণ্ড অপ্রতিরোধ্য আনন্দের শিহরণে সারা শরীর যেন অবশ হয়ে পড়েছিল।

মুহূর্তের জন্য এ অনুভূতির সান্নিধ্য পেলেও, বুঝলাম না এর কারণ। শুধু এইটুকু পরিষ্কারভাবে বুঝলাম, আমি যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছি। নতুবা যে 'আমি' কোন দিন কোন কাল্পনিক মহানের কাছে মাথা নীচু করি নি, সেই 'আমি' আজ আত্মসমর্পণের জন্য আকুল হয়ে উঠব কেন?

আমার জাগ্রত বাস্তব মন বজ্র-কঠিন হয়ে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করল। অবিরত সংঘাত এবং দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠলাম।

আত্রী আর পণ্ডিতজী—এঁদের প্রেমে দেখলাম একমাত্র আত্ম-সমর্পণ। সেখানে নিজেব অস্তিত্ব নেই, পুরুষের অহমিকা নেই, ভালবাসার অহঙ্কার নেই, প্রতিদান পাবাব আগ্রহ কিম্বা আশাও নেই। এ যেন এক অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে বুঁদ হয়ে বসে থাকা।

আত্রীব কথাগুলো বারবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলাম—আনন্দই যদি ভগবানের স্বরূপ হয়, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পাবার সবচেয়ে সরল ও সহজ পথ হল নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ প্রেম : পবিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ; সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি। নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকাব করে ভালবাসায় যে কী আনন্দ তিনি পেয়েছেন, তিনিই জানেন। আমি দেখেছি শুধু তার বাহ্য প্রকাশ। সেটা যে অভিনয় নয়, তাই বা বলি কী করে?

কিন্তু একথাও অস্বীকাব কবতে পারলাম না যে, সেদিনের সেই মুহূর্তে আমি যে আনন্দের আস্বাদন পেলাম, তাতে আমার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা ছিল না। একমাত্র ইচ্ছা ছিল আত্মসমর্পণ করবার।

বিনিদ্র রজনী চিন্তা এবং দ্বন্দ্বেব মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে লাগল। শেষে আব স্থিব থাকতে পারলাম না। ঠিক কবলাম, জিজ্ঞাসা করতে হবে পণ্ডিতজীকে কি সান্ত্বনা তিনি পেয়েছেন, অতীত স্মৃতির রোমন্থনেব মধ্যে ; জিজ্ঞাসা কবতে হবে তাঁব দগ্ধ হৃদয়ের স্থৈর্যের উৎস কোথায়? জিজ্ঞাসা করতে হবে, তিনি সুখী না অসুখী?

অনেকদিন পর আমাকে দেখে পণ্ডিতজী খুশী হলেন। এতদিন মন্দিরের সীমানা সযত্নে পবিহার করে চলেছি। মন্দিরের প্রতি আমার কেমন একটা ভয় এবং ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল। এই মন্দির আমাকে নিজের অলক্ষ্যে আত্ম-অবিশ্বাসী করে তুলছে। তমিস্রাকে

আমি ঘৃণা করি, কিন্তু এই মন্দির যেন চেঁচিয়ে বলে—ঘৃণ্য তুমি, সে নয়।

সেদিন আর গানের আসর বসল না। পণ্ডিতজীকে নিয়ে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বসলাম। কী ভাবে কথাটা আরম্ভ করা যায়? কিছুক্ষণ ধরে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে সোজা প্রশ্ন করলাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না।—আপনি বর্তমানে সুখী, না অসুখী?

বৃদ্ধ বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তাঁর চোখের ভাবেই বুঝলাম। জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন বলুন তো? কোন দিকে আপনি ইঙ্গিত করছেন?

সঙ্কোচের বাধা কেটে গিয়েছে। সহজভাবেই বললাম, আপনার কাছেই শুনেছি আপনি আপনার স্ত্রীকে কত ভালবাসতেন। সেই স্ত্রীকে আপনি হারিয়েছেন। আপনার কোনও সন্তান নেই, কেউ নেই। তবে আপনি আনন্দ পান কোথা থেকে? কোন আশায়, কী আনন্দে বেঁচে আছেন আপনি? আপনার জীবনে তো আর কিছুই পাবার নেই।

প্রাণ খুলে হাসলেন পণ্ডিতজী। বললেন, বুঝেছি। আচ্ছা একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—মৃত্যু কি আমার ইচ্ছাধীন?

কোন উত্তর দিলাম না। পণ্ডিতজী একটু চুপ করে অপেক্ষা করলেন, বোধহয় আমার জবাব পাবার আশায়। তারপর বললেন, জীবনটাই তো দুঃখময়। তাইতো আমি মৃত্যু চাই। কিন্তু তবুও, এই দুঃখময় জীবনের মধ্যেও আজ আমি পরিপূর্ণ সুখী। কারণ, আমার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ আমার স্ত্রী আজ বেঁচে না থাকলেও, তাকে আমি এখন আরও গভীরভাবে আমার হৃদয়ের মধ্যে পেয়েছি। এ ভালবাসায় কোন প্রতিদানের ব্যাপার নেই। সে থাকলো কি গেল, সে প্রশ্ন এখন আমার কাছে অবান্তর। এখন একমাত্র সত্য হল তাকে আমি ভালবাসি। তাই এত

দুঃখেও, এই প্রেমের আনন্দই আমার জীবনকে মধুময় করে রেখেছে।

একটু থেমে ধীরে ধীরে আবার বললেন, কিন্তু তবুও তো দুঃখ পাই বাবুজী। কারণ, এখনও আমি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি নি।

আমার প্রশ্ন যেন কঠিন পাথরে প্রতিহত হল। আবার বললাম,—কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে পাওয়াতেই তো আনন্দ, হারানোতে তো নয়।

গলত্,—পণ্ডিতজী আমাকে আর বলতে না দিয়ে দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলেন।—পৃথিবীতে এই একমাত্র জিনিষ আছে, যাকে পাওয়াতে প্রকৃত আনন্দ নেই, আনন্দ বিলিয়ে দেওয়াতে। পাওয়াতে তো সবই শেষ। প্রেমের যাত্রাব—আনন্দের পথে যাত্রার—তারও তো শেষ ওখানেই। মুহব্বতের আনন্দ যদি পেতে চান বাবুজী, তবে তা না-পাওয়াতেই পেতে পারেন, কারণ, সেখানে প্রেমের যে-অনন্ত পথে আপনার যাত্রা তার আর শেষ হবে না।

মানতে পারলাম না। বললাম, এ না হয় হলো ভালবাসার। কিন্তু ভালবাসা পাবাব ? প্রতিদানের ?

পণ্ডিতজী দৃঢ়স্বরে বললেন, বললাম তো, এই একটা মাত্র ক্ষেত্রেই প্রতিদান পেলে সব নষ্ট হয়ে যায়।

এ আরও অবোধ্য। এ যেন দেহকে বাদ দিয়ে দেহাতীতের সন্ধান। প্রেমের পাত্রই নেই অথচ প্রেম। কথাটা বললাম তাঁকে।

ভেবেছিলাম দর্শন চক্রের এ দুরূহ প্রশ্নের জবাব তাঁর অজানা। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, দেহাতীত কথাটাই তো দেহকে নির্দেশ করছে—তাই না কি ? দেহ তো রয়েছেই। প্রেমের পথে যাত্রার প্রথম সোপান তো দেহ-ই। আরম্ভ তো করছেন আপনি কাউকে ভালবেসে। তারপর আরও উপরে উঠে যান, দেখবেন সেই দেহের আর কোনও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হৃদয়ের। তা যদি না হয়, তবে শুধু দেহ পেলেই তো সব পাওয়া হত।

এবার আমার চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তবু্ও মানতে পারছি না। আমাকে কিছুক্ষণ ভাববার সুযোগ দিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, আপনারা আজকালকার লোক। এ যুগের রেওয়াজই হল লেন-দেন। তাই আমাদেব মতো বুড়োদের কথা আপনারা মানবেন না হয়তো। তবে আমি যা বললাম, তা আমি নিজে অনুভব করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, কিন্তু আমি যা বললাম তা' তো আমিও নিজে অনুভব করেছি। আমি তো দেখেছি, প্রেম, ভালবাসা সব ধাপ্পা।

বৃদ্ধ অমিত স্নেহে বললেন, বাবুজী, আপনার দুঃখ কী, তা আমি জানি না। তবুও বলছি, এ জওয়ানীতে নশা হয়, মুহব্বত হয় না। আর এই নশাতে ঠোকর্ খেয়ে আপনারা তামাম্ দুনিয়াটাকে সন্দেহ করেন, অবিশ্বাস করেন। আমার কথা শুনুন, ভালবাসতে চেষ্টা করুন। কি পেলেন আর কি পেলেন না, তার হিসাব করবেন না। দেখবেন, শান্তি পাবেন--আনন্দ পাবেন।

এ সেই আত্রীর কথা—'লৌট্ লৌট্‌কে আতা হুঁ মৈঁ, জা জা কে মঞ্জিল্ কে করীব্।'

কোন জবাব দিলাম না, কিন্তু মন বিদ্রোহ করে উঠল। এ পশ্চাদ্‌পসরণ, পলায়নপর বৃত্তি। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত অক্ষমের মতবাদ। এভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর মিলল না।

কেতকী হল না প্রস্ফুটিত, শোনা গেল না কোন কেকারব। তবুও অবিরত বৃষ্টি-লাঞ্ছিত নয়ন অবনত করে ঝরে পড়ল নার্গিস। আপেল, নাসপাতি এবং চেরী গাছগুলোর শাখায় দেখা দিল ফলের চিহ্ন। রুক্ষ, ঝলসানো পাহাড়ের গায়ে সবুজের শান্ত

আবরণ পড়ল। পথ-ঘাট জল আর কাদায় একাকার হয়ে গেল। শুকনো হাড়-বারকরা নদীটির শরীরে লাগল মেদের ছোঁয়াচ। গৈরিক-জল ধেয়ে এলো চারদিক থেকে। বৃষ্টির পর বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি আর ঝড়ে, সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীর যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ল।

অলক্ষ্যেই কবে যেন শীতঋতু নিঃশব্দে এসে পড়ল হিমালয়ের দ্বারে। পুরো দু'মাস অক্লান্ত বর্ষণের পর আবার যেদিন সূর্য দেখা দিল আকাশে, সেদিন পর্বতে পর্বতে, গাছে গাছে, ঘরে ঘরে পড়ে গেছে আসন্ন শীতের সাড়া। যে পাখীদের গানে বন-পর্বত সর্বক্ষণ মুখরিত থাকত, তারা সভয়ে পশ্চাদপসরণ করল।

সে এসে গেল। খাবার আর কাঠ জোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল কৃষকের ঘর। সামনের ক'টা মাস তাদের যুদ্ধ করতে হবে জল আর বরফের সাথে।

সে এসে গেল। গাছের পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ল পাথরের উপর। জম্মু-কাশ্মীরের বীভৎস অস্থি-পঞ্জর আবার ফুটে উঠল।

তখন জানুয়ারী মাস। যার জন্য এত ব্যস্ততা, এত প্রস্তুতি, এত সাবধানতা, সেই ভয়ঙ্কর শীত শেষ পর্যন্ত এসে গেল। তখন আমরা মেসে বসে আগুনের আস্বাদ নিচ্ছি প্রাণ ভরে।

বরফ না পড়লে এখানকার শীতকে কেউ শীত বলে না। পেট্রোম্যাক্সের আলো মেসের দরজা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। সুবেদার মেজর ভেঙ্কটস্বামীর সাথে দু রাউণ্ড শেষ করে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ তিনি হাত ধরে টেনে বসালেন,—আরে যাচ্ছো কোথায়?—টিজ্ স্নোয়িং। এখনই তো আর এক রাউণ্ডের সময়।

স্নোয়িং—বরফ পড়ছে? আমার বাঙালী জীবনে এ দৃশ্য দেখি নি। তাকিয়ে দেখলাম দরজার বাইরে। তুলোর ঝড়। হাজার

হাজার শিমূল-ফল ফেটে গিয়ে দুপুরের লু-এ যেন তুলোগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। চাপ বেঁধে সে তুলো ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার থেকে ঠিকরে উঠছে ময়ূরকণ্ঠী রং। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ভেঙ্কটস্বামী বললেন,—আরে, ওরকমভাবে কি দেখছো? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কাম্ আপ্—পুল্ আপ্ ইয়োর্ সোক্স্ ম্যান্। আর এক রাউণ্ড সাজিয়ে নিয়ে তিনি আমার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠলেন।

ভেঙ্কটস্বামীর সন্ধ্যা হয় রাত আটটায়, রাত হয় ইংরেজী মতে পরের দিন। রাউণ্ডের পর রাউণ্ড চালাতে চালাতে আমি যখন নক্ আউট্ ডিক্লেয়ার্ড হলাম, ভেঙ্কটস্বামী তখন মোটে একটার জায়গায় দুটো পেট্রোম্যাক্স দেখছেন। আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বললেন, —নাঃ, তোমার দ্বারা কিস্সু হবে না—নট-এ বিট্, তেল্। কটা আলো দেখছো?

অতি কষ্টে বললাম, আলো কই গুরুদেব? সব তো অন্ধকার।

—হো-হো, হি-হি,—ভেঙ্কটস্বামীর থলথলে শরীরটা আমার ঝাপসা চোখের সামনে সার্কাসের হাতীর মত নাচতে লাগল। হাসি আর তাঁর থামতে চায় না। শেষে দম নিতে নিতে বললেন, ব্লাডি হেল্—লুক্, কটা আঙ্গুল দেখছো?

জড়িয়ে আসা চোখ দুটো অতি কষ্টে টেনে বললাম, আঙ্গুল আবার কোথায়? দেখাচ্ছো তো বুটশুদ্ধ একটা পা।

হাসির তোড়ে আইয়ার টেবিলের উপর গড়িয়ে পড়লেন। গ্লাসে আর হল না। বাকীটুকু বোতল থেকে সোজা মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে, গুরুদেব খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেললেন বাইরে বরফের মধ্যে। তারপর টলতে টলতে উঠে বললেন,—কিস্সু হল না এতে—এব্সোলিউট্লী নাথ্থিং। এখনও মাত্র দুটো আলোই দেখছি। ওই আলো যখন পাঁচটা হবে, তখন হল আমার নেশা, —বুঝলে ওল্ড্ বয়্? তারপর এক হেচকা টানে চেয়ার থেকে

আমায় তুলে বগল-দাবা করে ভেঙ্কটস্বামী দুলতে দুলতে বেরিয়ে পড়লেন।

বরফ আর বরফ। পৃথিবীতে যে এত বরফ জমা হয়ে ছিল, তা কে জানত? বরফ-পড়া দেখবার আনন্দ আমার তখন মরে গেছে। একটা দুঃসহ বোঝা যেন চেপে ধরল জম্মু-কাশ্মীরকে, আর সেই চাপে আমিও ক্রমশ মুষড়ে পড়লাম। সব গান, সব আনন্দ, সব উচ্ছলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে ক্লান্তি লাগত।

সেদিনকার ঘটনার পর আর মন্দিরে যাই নি। ভেঙ্কটস্বামী তাঁর বিরাট বপুকে খাড়া রেখেছেন শুধু রাম্-এর উপর ভর করে। আমার পাকা সৈনিক হবার ট্রেণিং প্রায় সমাপ্তির পথে। এখন যুদ্ধ বাধলে, কতগুলো মানুষ মেরে পূর্ণাহুতি দিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এমন সময় আবার অঘটন ঘটলো।

তাঁবুর দরজা খুললেই পরিপূর্ণভাবে দেখা যেত পীরপাঞ্জাল। বরফ-পড়া আরম্ভ হতেই পীরপাঞ্জাল নিজেকে ঢেকে নিয়েছিল ঘন পুরু বরফের চাদরে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অথবা অবসর সময়ে প্রতিদিন চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ক্রমশ মনে হল আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমার শত কাজের মধ্যেও পীরপাঞ্জালের দিকে তাকান যেন একটা নেশার মত হয়ে গেল। মন আমার উধাও হয়ে যেত সেখানে। মিশে যেত তার নীলাভ আভার সাথে। হঠাৎ সেদিন, সেই অনুভূতি আবার আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল।

একটা অদ্ভুত, অস্থির অনুভূতি। একটা সুদৃঢ় আকর্ষণ, নিবিড় কৌতূহল এবং অজ্ঞাত ভয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। হিমালয় আমাকে যেন ডাক দিচ্ছে পীরপাঞ্জালের হাতছানি দিয়ে। ভিতর

থেকে একটা অশ্রান্ত, দুর্বার তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম ওখানে যেতে। কিন্তু উপায় নেই।

তখন, সেই দুপুরে, অফিসের পর ভেঙ্কটস্বামী তার তাঁবুতে বোতল জড়িয়ে শুয়েছিলেন। ইচ্ছা হল ছুটে যাই তার কাছে। তাঁর সঙ্গ হয় তো আমাকে উদ্ধার করবে একটা আসন্ন বিপদ থেকে। কিন্তু শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। অসহায়ভাবে বসে থাকতে থাকতেই, কখন সে ভয়ের ভাব কেটে গেল। বিরাট, ভয়ঙ্কর পীরপাঞ্জাল এক পরমানন্দময় রূপ নিয়ে যেন আমার অন্তর স্পর্শ করল। সেই স্পর্শমণির পরশে আমার অশান্ত হৃদয় মুহূর্তে আনন্দধারায় স্নান করে উঠল। পীরপাঞ্জাল আমার কাছে ধরা দিল; আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

সেই মুহূর্তে মনে হ'ল আমার সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা যেন মিথ্যা। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। মোহাবিষ্টের মত হাত জোড় করে প্রণাম করে, মনে মনে প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করলাম—হে মহান, হে বিরাট, হে মহাশক্তিময় আনন্দের আধার, আমি তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করলাম। "মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।" উন্মত্তের মত আমার অন্তর যেন চীৎকার করে উঠল "মধুনক্তমুতোষসো, মধুমৎ পর্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।" আমার দেহ, আমার জীবন, এই প্রকৃতি সমস্ত মধুময় হয়ে উঠল। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য যা ঘটল তা হল, ঠিক সেই মুহূর্তে তমিস্রার মুখখানা যেন আমার হৃদয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পীরপাঞ্জাল এবং তমিস্রা, পরমাত্মা আর জীবাত্মা সব যেন একাকার হয়ে গেল আমার সামনে।

অনন্ত সময়-সমুদ্রের মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু। তীব্র বিদ্যুৎ চমকের পরক্ষণেই যেমন অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ওঠে, আমার জাগ্রত মনও এই অনুভূতির পরক্ষণেই দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ

করে উঠল। স্থির বুঝলাম, অতিরিক্ত চিন্তা এবং অবিরত দ্বন্দ্বে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার দুর্বল মন তাই এই অলীক স্বপ্নে ডুবে যেতে চাইছে। এ দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আত্রী এবং পণ্ডিতজীর কথাগুলো আবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় চিন্তা করলাম। আত্রী কাপুরুষ। সমাজের কঠিন শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না। আর নার্গিস্—এ অবস্থায় আর দশজন নারী যা করত, সেও তাই করেছিল। নারীত্বের চরম অবমাননায় তার অভিমানাহত অন্তর আত্রীর ভালবাসা চেয়েছিল, চেয়েছিল একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, এ কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারে নি। কিন্তু আত্রী, সমাজের ভয় ছাড়াও, ঘৃণা করতেন নার্গিসের বিধ্বস্ত দেহ—কাপুরুষের চিরন্তন সংস্কার। তাই নার্গিসের অভিমানকে না বোঝার ভান করে, তিনি নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজে নিলেন। আত্রী শুধু কাপুরুষই নন, আত্রী ভণ্ড।

পণ্ডিতজী- তিনি আজ জীবনের শেষ সীমায়। এ অবস্থায় জীবন সম্বন্ধে, ভোগ সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদের আশ্রয় না নিয়ে তাঁর উপায়ই বা কী? বার্ধক্যের একমাত্র অবলম্বনই তো অতীতের স্মৃতির রোমন্থন। দেহাতীত প্রেম—মনে মনে ব্যঙ্গ করে উঠলাম। তমিস্রার উপেক্ষাকে নৈরাশ্য দর্শনের মধ্যে বিচার করলে, আমিও এ সান্ত্বনা পেতে পারি। কিন্তু কেন? আমার জীবন তো আজ শেষ সীমায় নয়, দেহ তো হয়নি বার্ধক্য-জর্জর? আমার এই দেহের মধ্যে আছে একটি জীবন্ত হৃদয়, এবং তাতে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্ত-স্রোত। আমি কেন নিজের সম্ভাবনাময় জীবনকে নিঃস্ব করে রাখব তমিস্রার উপাসনায়?

মনে পড়ল সেদিনকার কথা, যেদিন তমিস্রা ফিরে এসেছিল পিতৃগৃহে। ওকে আমি ভালবাসতাম। সে ভালবাসার মধ্যে নৈরাশ্য দর্শন অথবা দেহাতীত প্রেমের ভণ্ডামী ছিল না। আমি চেয়েছিলাম সমাজের সমস্ত উপহাসকে উপেক্ষা করে তাকে বিয়ে

করতে; আমার প্রেমের প্রগাঢ়তা এবং সত্যতার প্রমাণ দিতে। বিধবা-বিবাহ সমাজে চলে নি, কারণ যে যতই বক্তৃতা দিক, বিধবাকে লোকে ঘৃণা করে।

আমি চেয়েছিলাম ওকে সুখী করতে; ওর জীবনকে সফল, আনন্দময় করতে। কিন্তু কয়েকদিনের মাত্র পরিচয় যার সঙ্গে তারই নিস্ফল-স্মৃতিতে তমিস্রা আমাদের এতদিনকার সৌহার্দ্য, প্রীতি, প্রেম সমস্ত অস্বীকার করল।

এখনো মনে আছে কী অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম। উপন্যাসের ব্যর্থ-প্রেমিকের মত জীবনটাকে শূন্য মনে হয় নি যদিও, কিন্তু অনুভব করেছিলাম এক অসহ্য দাহ--দেহের প্রতি পরমাণুতে যেন চলছে আণবিক বিস্ফোরণ। তমিস্রা বুঝল না, শুধু ওর দেহের প্রতিই আমার লোভ ছিল না।

চাকরী জীবনের এক স্বল্প অবসরে ঘটে গেল এই দুর্ঘটনা। দগ্ধ হৃদয় নিয়ে ফিরে গেলাম আমার কর্মস্থলে। তমিস্রা আর আমি একই শহরে একই আকাশের নীচে আছি, এ চিন্তা হয়ে উঠেছিল অসহ্য। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে এসেও স্বস্তি পাই নি। তমিস্রার পুঞ্জীভূত ঘৃণার বিস্ফোরণ, তার কঠিন কঠোর উক্তি আমার জীবনকে কেন্দ্রচ্যুত করে দিল চিরদিনের মতো।

মা ছিলেন না। গৃহের আকর্ষণও আমার ছিল না। ছোটবোন রেণুর চিঠিতে খবর পেতাম তমিস্রা পাশ করল আই. এ.; ভর্তি হল থার্ড ইয়ারে। তারপর কর্ম-স্রোতে ভেসে বেড়ালাম লক্ষ্নৌ, কাণপুর বেরিলী, দিল্লী।

সাব্—চমকে উঠলাম রামলুর ডাকে।

কিঁউ বুলায়া সাব্?

আশ্চর্য হলাম—কখন ডেকেছি ওকে?

সামলে নিয়ে বললাম।—পেগ্ লানা।

রামলু দৃশ্যতই আশ্চর্য হল। আজ এক বছরের ওপর আমার

সঙ্গে আছে রামলু। লাঞ্চের পর পেগ নিতে দেখেনি কখনো। তবুও বিশ্বস্ত অনুচর অভ্যস্ত হাতে এগিয়ে দিল গ্লাস। মহাশত্রু পীরপাঞ্জালকে প্রতিরোধ করবার অন্য কোন উপায় নেই।

কিন্তু চিন্তা আমাকে ছাড়বে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে সবে চোখ বুজেছি, ভেসে উঠল দিল্লীতে আমার অফিস-কামরার ছবি। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একখানা খাম।

কে লিখল ? এক রেণু ছাড়া আর তো কেউ লেখে না। কিন্তু হাতের লেখা তার নয়। দরকারী ফাইল সরিয়ে রেখে খামটা খুললাম।

সুদীর্ঘকাল ধরে যে উন্মত্ত সাগর শান্ত হয়ে এসেছিল, তাতে জাগল প্রচণ্ড আলোড়ন! চমকে উঠলাম, তমিস্রার চিঠি। রেণুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে আমার ঠিকানা। চমকে দেবার এবং প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে বিচ্যুত করবার অভ্যাস তমিস্রার বাল্যকাল থেকে। সেদিন পাঠানকোট ট্রানজিট্ ক্যাম্পের মেসের টেবিলেও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম চিঠিখানায়। তমিস্রার বাবা আর নেই। এ অবস্থায় অভিভাবকহীন হয়ে নাবালক ভাই পলটুকে নিয়ে ওখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই চলে আসছে দিল্লীতে তার মামার কাছে। লিখেছে—"রাগ করেছো জানি। আর এও জানি, এই বিরাট পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। ··মামার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করবে।···তবে, পাগলামী বাদ দেবে। আমি আমার ছোটবেলার কালোদাকেই দেখতে চাই।" চোখদুটো আটকে রইল অনেকক্ষণ শেষের লাইনটিতে। তমিস্রার ব্যঙ্গ যেন চোখের সামনে রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একাধিক বিনিদ্র রজনী কেটে গেল কর্তব্য নির্ধারণে। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম দিল্লী ছাড়তে হবে। সুযোগও এসে গেল, হঠাৎ কোম্পানীর পাটনা অফিসে বদলী হলাম।

এখনো ভেবে আশ্চর্য হই কেন সেদিন দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম! তমিস্রাকে ঘৃণা করি—এ সান্ত্বনা-বাক্য হাজারবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেও শান্তি পাই নি। —ভালবাসি? —অসম্ভব। ভালবাসতাম একদিন। —ভয় করি? কিন্তু কেন?

আত্রী অবশ্য বলেছিলেন, মহৎ প্রেম দূরে সরিয়ে রাখে। পরে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এই দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই তো প্রেম হয় মালিন্যমুক্ত। তাই না প্রেমিক কবি বলেছেন--'লৌট্ লৌট্ কে আতা হুঁ মৈঁ, জা জা কে মঞ্জীল কে করীব্।' আমি কিন্তু স্বীকার করতে পারিনি এই ব্যাখ্যা। পণ্ডিতজী বলেছিলেন—এ হল অভিমান; এই তো হল সচ্চি মুহব্বতের বিশুদ্ধ আনন্দ। কিন্তু এটা স্বীকার করা ছিল আমার পক্ষে চরম লজ্জাকর।

আরো আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, তমিস্রার হৃদয়ের মত আমার নিজের হৃদয়ও আমার কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। পাটনাগামী ট্রেনের কামরায় বসে হঠাৎ মনে হয়েছিল দিল্লী না ছাড়লেই ভাল হত। হয়তো তমিস্রার মনের পরিবর্তন হয়েছে: হয়তো আমার প্রেমকে স্বীকার করতে আজ সে প্রস্তুত। নতুবা দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ চিঠি লিখবে কেন তমিস্রা।

এ 'কেন'র উত্তর হয়তো তমিস্রাও দিতে পারত না। আবার এই 'হয়তো'র মরীচিকার পিছনে ছুটেই একদিন মহেন্দ্রঘাটে ষ্টীমারে চেপে বসলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে। নিশ্চিত ছিলাম, তমিস্রা এত শীঘ্র দিল্লী যায় নি। কিন্তু মজঃফরপুর স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়তেই মনে হল একটা প্রকাণ্ড ভুলের সম্মুখীন হতে চলেছি। তবুও ফিরতে পারলাম না।

সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী পৌঁছে শুনলাম তমিস্রা কয়েকদিন আগে দিল্লী রওনা হয়ে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তমিস্রার সামনে দাঁড়াবার সাহস আমার ছিল না।

বাইরে অশ্রান্তভাবে বরফ পড়ে চলেছে। তাঁবুর দরজাটি একবার তুলেই তাড়াতাড়ি ফেলে দিলাম। পীরপাঞ্জালের সামনা-সামনি হবার সাহস আমার নেই।

অশান্ত ভবঘুরে জীবনে কতগুলো বসন্ত এসে চলে গেল। মনের ভিতর চলেছে অবিরত ভাঙ্গা-গড়া। সেই সঙ্গে হয়েছে বাহ্যিক পরিবর্তন। প্রাইভেট ফার্মের চাকরী হঠাৎ শেষ হল। পিছিয়ে এলাম মজঃফবপুবে। নিলার্ম পোস্ট-অফিসের চাকরী। তমিস্রা সুদূর দিল্লীতে, অতএব বাড়ীর কাছে থাকতে ভয় নেই।

মধ্যের কয়েকটি বছরে আরও পরিবর্তন ঘটল। রেণুর বিয়ে হয়ে গেল ; বাবা মারা গেলেন। পিছনের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে একদিন এসে দাঁড়ালাম রিক্রুটিং অফিসেব মাঠে। দ্রুত বদলী হতে থাকল কর্মস্থল—নাগপুব, কাম্পটি, দিল্লী।

আবাব দিল্লী। আশ্চর্য! সুদূর উত্তর বিহারে যার জন্ম, তাব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে দিল্লী। ট্রেনিং-সেণ্টার থেকে কাশ্মীর ফ্রণ্টে পোস্টিং অর্ডার নিয়ে একদিন ভোরে এসে নামলাম দিল্লী স্টেশনে। চাব-পাঁচ বছবের ব্যবধান। দিল্লীর কোন পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তিত হয়েছি আমি। অটল, অপরিবর্তনীয়, স্থাণু দিল্লী এবং পীরপাঞ্জাল আমার হৃদয় নিয়ে কী এক খেলা খেলছে বার বার!

দিল্লী। এই দিল্লীতে থাকতেই একদিন পেয়েছিলাম তামিস্রার অসম্ভাব্য চিঠি। মামার ঠিকানা জানা ছিল। মধ্যের দীর্ঘ ব্যবধানে আমার চিন্তা-ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল অনেক। স্টেশনে মালপত্র জমা রেখে টাঙ্গায় উঠে বসলাম কেরলবাগের উদ্দেশ্যে। বেশ মনে আছে, আকুল ভাবে মনে মনে অবৃত্তি করেছিলাম আকবর ইলাহা-বাদীর দুটি ছত্র :

সৌ জান সে হো জাউঙ্গা রাজী মৈঁ সজা পর।
পহলে ও মুঝে আপনা গুনহগার তো কর লেঁ॥

শাস্তি নিতে তো আমি উন্মুখ হয়ে আছি: প্রথমে সে আমাকে নিজেই দোষী তো করে নিক।

তমিস্রা ছিল না—এখানে থাকতো না। একটা গার্লস্ স্কুলে চাকরী পেয়ে পলটুকে নিয়ে থাকত সেখানকার কোয়ার্টারে। আমার অবিন্যস্ত পোষাকের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ করে মামা বলে দিলেন তার ঠিকানা।

আমার বুকের স্পন্দন তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কত দিন হবে—চার বছর? অথবা কতগুলো অসহ্য যুগ?

চাকরটা প্রথমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আমার পোষাক আর চেহারা। পিতৃ-পিতামহের পূর্ণ পরিচয় নেবার পর একটা চেয়ার দেখিয়ে আদেশ করল বসতে। জানাল, মেমসাহেব স্নান করছেন।

বুকের মধ্যে পড়ছে হাতুরির ঘা। সমস্ত চিন্তা হারিয়ে গেছে। কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। চমকে জেগে উঠলাম তমিস্রার উচ্ছল কলকণ্ঠে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত: তারপরেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল তমিস্রা। চাকর-দাসীর সামনে স্কুল-মিস্ট্রেসের চপলতা শোভা পায় না।

তমিস্রার ব্যবহারে কোন ত্রুটি ছিল না; কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সেখানে হৃদয় ছিল না। আমার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে সে চলে গেল স্কুলে। একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রেখে গেল—আমার জন্যও স্কুল কামাই করা চলে না একদিন। সেইসঙ্গে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল তার কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির জন্য। শনিবার শীঘ্রই ফিরবে স্কুল থেকে। পলটুকে আদেশ দিয়ে গেল আমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে।

ফিরে এলো দুটো নাগাদ।

মনে হল, এক দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে আমি আর তমিস্রা কক্ষচ্যুত দুটি গ্রহ আবার সম্মুখীন হয়েছি পরস্পরের। কী বলব, কোথা থেকে আরম্ভ করব? কোন কথাই আরম্ভ হয় নি অথচ সব বলা, সব শোনাই তো শেষ হয়ে গেছে। পলটু বোকার মত বসে আছে চারপাইটার ওপর। আশ্চর্য হয়ে গেছে আমাদের ক্লান্তিকর নৈঃশব্দে।

ঝি চা দিয়ে গেল।

—কাকাবাবু কবে মারা গেলেন? চা'এর কাপে একটা নরম চুমুক দিয়ে তমিস্রা জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। একটা অদ্ভুত ভাললাগা, একটা অপ্রতিরোধ্য কান্না যেন চেপে ধরল আমার কণ্ঠকে। তমিস্রা বোধ হয় বুঝতে পারল আমার অবস্থা। পলটুর সামনে পাছে কোন অশোভন দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাই চট্ করে বলল, একটু বেড়াতে যাবে?

এতক্ষণে হুঁস হল আমার। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বিকেল নেমে আসছে একটা রঙীন স্বপ্নের মত। শীতের নরম বিকেল।

একটা ট্যাক্সি ধরে এসে পৌঁছুলাম কুতব-এ।

তমিস্রা জানতো না আমি সৈনিক। জিজ্ঞাসা করেছিল—

—চাকরী-বাকরী কিছু করছো, না সেই বাউণ্ডুলে বৃত্তিই এখনো আছে? কণ্ঠের শ্লেষ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল তার কথায়।

কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম পশ্চিমের দিগন্ত বিস্তৃত ঝাউ আর বাবলা বনের দিকে। আমার বোঝা-পড়া করবার ছিল ওর সাথে। ফ্রন্টে যাবার আগে একবার চরম কথা জেনে নেবার অদম্য ইচ্ছা আমি সংবরণ করতে পারি নি। তাই তার শ্লেষ গায়ে না মেখে বললাম, এখান থেকে বড় সুন্দর দেখায় দিল্লী শহরটা—তাই না?

বাজে কথা রাখো, তমিস্রার কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর ফুটে উঠল।

স্থানীয় এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে এসেছিল তমিস্রা। ওর ছোটভাই পলটু ওপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি নিরুত্তরে ওর মুখের দিকে চেয়ে মন বোঝবার চেষ্টা করলাম।

হু হু করে বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে কুতবকে। তমিস্রার অসংযত চুলগুলো তার অতি সাবধানতাকে উপেক্ষা করে আমার মুখের উপর আছড়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। কুতবের এই সর্বোচ্চ তলায় আজ আমি আর তমিস্রা একাকী—পাশাপাশি। বহুদিন পূর্বের কতগুলো দিন আমার স্মৃতির আকাশে ভেসে উঠল। এই তমিস্রাকে আমি ছেলেবেলা থেকে কত নিবিড় করে ভালবেসেছি।

আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। কীভাবে যে কথাটা তুলব ভেবে পাচ্ছি না। বহুদিন অদর্শনের সঙ্কোচ বার বার আমার উৎসাহকে দমিয়ে দিচ্ছে। শেষে হঠাৎই বললাম, এখান থেকেই না বহু প্রেমিক-প্রেমিকা ঝাঁপ দিয়ে মরেছে তমিস্রা।

তমিস্রার চোখে এক নির্বোধ দৃষ্টি ফুটে উঠল। তার চিন্তার সেই স্থবিরতার সুযোগ ছাড়লাম না। বললাম, কালই আমি যাচ্ছি ফ্রণ্টে। বোধ হয় জান না, আমি সৈন্য বিভাগে চাকরী নিয়েছি। হয়তো আর দেখা হবে না, হয়তো আর সুযোগ পাব না কথা বলবার। তাই অনেকদিন আগের প্রশ্নটাকে আজ আবার রাখছি তোমার সামনে। বলো—হ্যাঁ, কি, না।

তমিস্রার নির্বোধ চোখ দুটোতে জেগে উঠল বিস্ময়, ঘৃণা, ক্রোধ পর পর। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাথে বলল, তুমি না ছোটবেলা থেকে আমায় ভালবাস? এই বুঝি তার নমুনা? তারপর হঠাৎ সামলে নিয়ে বলল, কালোদা, তুমি জান ওই ছোট ভাইটি ছাড়া আমার কেউ নেই। আমাকে সেই ছোটবেলায় যেমন ভালবাসতে, তেমনই ভালবেসে আবার আমার পাশে দাঁড়াতে পার না? সেদিন তো এই দেহটার ওপর তোমার লোভ ছিল না।

ওর কথাগুলি যেন আমার হৃদয়ে আঘাত করতে লাগল।

একটু থেমে বললাম, মেয়ে-পুরুষে নিছক বন্ধুত্ব হয় না তমিস্রা। সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। তোমার দুঃখে আমিও সত্যিই দুঃখ পাই। তাই তো তোমাকে চিরকালের মত বেঁধে নিয়ে দাঁড়াতে চাই তোমার পাশে।

চোখ দুটো ওর যেন জ্বলে উঠল হঠাৎ। কঠিন কণ্ঠে বলল, বুঝলাম, তোমার পশুত্ব এখনো মরে নি। যাক, আমি এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না। তবে আর তোমাব এখানে থাকা চলবে না। তুমি আজই যাও।

হতবাক হয়ে গেলাম। তবুও সামলে নিয়ে বললাম, লেখাপড়া শিখেও তোমার কুসংস্কার আজও এত প্রবল? বেশ সামাজিক সংস্কারই যখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এসো, আমবা এখানকার মৃতের দলে আরও দুটি সংখ্যা যোগ করি। এতে তো আর বলবে না যে, তোমার দেহের প্রতিই আমাব লোভ। আমি জানতে চাই যে তুমি আমায় ভালবাস।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল তমিস্রা! মনে হল, এ তমিস্রা সে নয়। এ যেন এক আক্রমণোদ্যত হিংস্র পশু। তারপব চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুমি পশু, তুমি নীচ, তুমি—। হাফাতে লাগল তমিস্রা। তারপর একটু স্থির হয়ে আবার বলল, আমার লজ্জা হচ্ছে যে একদিন তোমাকে আমি দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতাম।

মুহূর্তে নিজেব ভুল আমাব কাছে ধরা পড়ল! বুঝলাম ও আমাকে কতখানি ঘৃণা করে। এই জীবনে মিলন তো নয়ই, মৃত্যুর মধ্য দিয়েও যে মিলনের অলীক স্বপ্ন মানুষ দেখে, তমিস্রা আমাকে তাও দিতে প্রস্তুত নয়।

বোঝাপড়া হয়ে গেল—শুধু ওর সাথেই নয়, নিজের সাথেও। মানুষের তথাকথিত পরম কোমল বৃত্তির আড়ালে যে কত বড় ধাপ্পাবাজি লুকিয়ে আছে, তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল। এরপর

আর এক মুহূর্তও আমার দিল্লীতে থাকা সম্ভব ছিল না। সেই রাতেই রওনা হলাম।

মনের মধ্যে একটা হিংস্র উল্লাস জেগে উঠল। ভাগ্যবান স্বামী, ভাগ্যবান পণ্ডিতজী, তমিস্রার মতো নারীর সংস্পর্শে তারা আসেন নি। আসলে, নিশ্চয়ই নিজেদের মত পরিবর্তন করতে বিলম্ব করতেন না। না, তমিস্রা নয়, প্রেম নয়, মন্দিরও নয়। প্রচণ্ড শক্তিতে তমিস্রাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই সময় কানে গেল ভেঙ্কট স্বামীর ডাক, হ্যালো ইয়ং বয়, অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে বসে কি ভাবছ?

আইয়ার তার ছিমছাম শরীরখানা অতিকষ্টে আমার ঘরের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে গ্রেট-কোট খুলে বরফ ঝাড়তে লাগলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কাল সে হতভাগা বরফ পড়া শুরু হয়েছে। ব্লাডি হেল, এস, লেট্স্ রিল্যাক্স্।

আমার মন স্বস্তি খুঁজছিল।

ভেঙ্কটস্বামী ছিলেন সেই জাতের লোক, যার পিস্তলের চেম্বার সব সময় লোড করা থাকত, বাক্স ভরা থাকত রাম্, আর রিল্যাক্সেশান্ হল ড্রিঙ্ক। রাম্-হীন ভেঙ্কটস্বামী এবং বরফহীন কাশ্মীর, দুই-ই সমান অসম্ভব।

ছিপি খুলতে খুলতে ভেঙ্কটস্বামী বললেন, শুন্, আজ তোমাকে রাম্-এর এক নতুন কম্বিনেশান্ খাওয়াব। ইনভেন্টেড বাই মি। গেট সাম হট ওয়াটার। রাম্-এর সঙ্গে চতুর্গুণ অর্থাৎ গরম জল মিশিয়ে তিনি যে গ্লাস এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, তা স্বাদে বিষতুল্য, গুণে ভয়ঙ্কর। সে কম্বিনেশানের আধবোতল খেয়েই, এক বোতলী আইয়ার পাঁচটা লণ্ঠন দেখতে লাগলেন, আমি এক পেগেই তিনটে। তারপর তিনি মনের আনন্দে গান ধরলেন।

তাঁর জন্যেও যে প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, ভেঙ্কটস্বামী তা কল্পনা করতে পারেন নি। গানের ভাষা, সুর এবং গিটকিরি

তার গলায় যত খেলা করতে লাগল, আমার লণ্ঠনের সংখ্যা তত আসতে লাগল কমে। শেষে যখন একটা আলোই দেখছি, তখন হাত জোড় করে বললাম, দোহাই গুরুদেব, আপনার ও দাওয়াই দিয়ে আমার নেশাটা আর মাটি করবেন না।

ভেঙ্কট স্বামী মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে লাফিয়ে উঠলেন, ব্যস্ নাউ ইউ হ্যাভ কমপ্লি টড্ ইওব ট্রেনিং। আমার গানই হল এর মিটার। নভিস্‌রা আমার গানে ওই একটা লণ্ঠনও দেখে না, দেখে শুধু অন্ধকার। এস শিক্ষা-সমাপ্তির উৎসব উদ্‌যাপন করা যাক।

গ্লাসটা তুলেই চমকে উঠলাম। লাল টকটকে রাম-এর ভিতরে তমিস্রা মিটি মিটি হাসছে--সেই তমিস্রা, যে আমাকে বলেছিল পশু। তাড়াতাড়ি গ্লাস নামিয়ে রাখলাম।

আইয়ার অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছেন।—তুমি বিয়ে করেছো ওল্ড্ বয়? করো নি? নাইস্। দেন্ ইউ মাস্ট গো টু সী—। ডু'ই নো, আমার ওয়াইফ—সে আমার চেয়েও মোটা—জাস্ট এ্যান এলিফ্যাণ্টাইন্ ফিগার।

আড় চোখে গ্লাসের দিকে তাকালাম। তমিস্রা নেই। এই সুযোগ। চোখ বুঁজে এক নিঃশ্বাসে খালি করে দিয়ে বললাম, ইজ শী?

—সার্টেনলী ম্যান, আইয়ার ছোট ছোট চোখ দুটো আমার মুখের উপর রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন।—সে কী ভাবে হাঁটে জানো?—লুক্, আইয়ার উঠে নাচতে লাগলেন। ধাক্কা লেগে আমার হোয়াটনট র‍্যাক্‌টা হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল।

লণ্ঠনটার দিকে তাকালাম। একটা-দুটো-তিনটে। হেল্, তিনটে আলো থেকেই তমিস্রা আমাকে মুখ ভেংচাচ্ছে—সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তমি। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুদেব, আলো কটা?

নাচ থামিয়ে চেয়ারে বসে আইয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লণ্ঠনের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চোখ দুটো তাঁর বার বার পিছলে পড়ছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,—মাই গ্যাড্, পাঁচটা ?

—ব্যস্, স্টপ। আমাদের নেশা হয়েছে।

ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে ভেঙ্কট স্বামী বললেন, সো উই রিটায়ার ? বেশ।

চেয়ারে বসেই আইয়ারের অপস্রিয়মাণ গলা শুনতে পেলাম—

জীম্স্ এণ্ড জীল্ল্, ওয়েণ্ট্ আপ্ দি হীল্ল্
টু ফেচ্-চা ব্কেট্ অফ্ আটার্,
জীম্স্ ফেল্লা ডাউন্ এণ্ড ব্রোক্ হিজ ক্রাউন্,
এণ্ড্ জীল্ল্ কেম্ রানিং আফ্টর্।

বরফ পড়ার আর শেষ নেই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত জল ছিল সব আকাশে উঠে গেছে আর ঝরে পড়ছে তুলো হয়ে। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখনও বরফ পড়ে চলেছে। তাঁবুর ছাদটা প্রায় টেবিলের মেঝে ছোঁব ছোঁব করছে।

অফিসে সারাদিন কাটল এক প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্য দিয়ে। বরফ পড়া একটু বন্ধ হতেই শুভ্র পীরপাঞ্জাল যেন তার ভয়ঙ্কর চোখ দিয়ে আমার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য বোধ করি। ওই পীরপাঞ্জালই আমার সর্বনাশ করবে। টেবিলটা ঘুড়িয়ে পিছন ফিরে বসলাম।

সামান্য একটু সময়ের জন্য আবার বরফ পড়া বন্ধ হল। প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার চোখ দুটো পিছনে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখাচোখি হয়ে গেল এই ভয়ঙ্কর পাহাড়ের সাথে। সাদা ধবধবে বরফের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ আকাশী নীল রং ফুটে বেরুচ্ছে!

লাঞ্চের পর তাঁবুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে গত রাতের ক্লান্তি দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম। খোলা দরজা দিয়ে আবার ওই

পাহাড় কুটিল কটাক্ষ হানলো। আবার সেই অনুভূতির প্রাথমিক ছোঁয়াচ পেলাম। এক লাফে বিছানা ছেড়ে, তাঁবুর ফ্ল্যাপ দুটো টেনে দিলাম। ঠিক করলাম, তাঁবুটা অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু 'বাহির দুয়ার' বন্ধ করলেই যদি 'ভিতর দুয়ার' অবরুদ্ধ হত, তবে পৃথিবীর অনেক সমস্যাই সহজ হয়ে যেত। খোলা দরজা দিয়ে যে পীরপাঞ্জালকে দেখেছিলাম, বন্ধ দরজার ভিতর সে আবার দেখা দিল তমিস্রাকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রেম আর ভগবান—একটাকে স্বীকার করলেই, আর একটাকে স্বীকার করতে হয়। প্রেম অর্থে অবশ্য সোহলের প্রেম নয়—আত্রী আর পণ্ডিতজীর প্রেম। আমার সমস্ত যুক্তি তর্ক দিয়ে মনে মনে যুদ্ধ করতে লাগলাম। কোথায় ছিলেন ভগবান, আমার পিতার মৃত্যু সময়ে? তার অসহ্য ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেখে আমি পৃথিবীর যাবতীয় দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—তাকে বাঁচিয়ে দিতে এবং পরিবর্তে ওই কষ্ট আমাকে দিতে। কই, কেউ তো শোনে নি সে কথা? এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, ওর জীবন না দিতে পারলে অন্ততঃ মৃত্যুও ত্বরান্বিত কর, যাতে আর কষ্ট না সহ্য করতে হয়। কিন্তু, তিলে তিলে অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে, তিনি মারা গেলেন দুমাস পর।

বিশ্লেষণ করলাম নীতিশের ঘটনা। রেলে চাকরী করত বন্ধু নীতিশ। বিয়ে করেছিল মাত্র দু'মাস আগে। এমন সময় একদিন একটা ব্রীজ পরীক্ষা করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল বর্ষার কোশীতে। তিন দিন পর তার বিকৃত মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল কয়েক মাইল দূরে। কী অপরাধ ছিল তার? কী অপরাধ করেছিল ওই তরুণী মেয়েটি, যার জীবনের সব আশা, সব সুখ শেষ হয়ে গেল মাত্র দু মাসের মধ্যে? এগুলো না হয় ব্যক্তিগত ঘটনা। কিন্তু কাশ্মীরের উপরেই যে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড এবং অত্যাচার হয়ে গেল, এটাই

বা কোন মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়? ভগবান যা করেন, তা যদি মঙ্গলের জন্যেই হয়, তবে কার কি মঙ্গল হল এতে? প্রতিপক্ষ হয়তো বলবেন এ হল অপরাধের শাস্তি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু, অপরাধের শাস্তি দেবার ক্ষমতা যদি তার থাকে, তবে ক্ষমা, দয়া, মমতা এগুলোও তো নিশ্চয়ই থাকবে সেই কল্পিত দয়াময়ের। যদি না থাকে, তবে সে দয়াময় নয়, সে শয়তান। যে হস্তে মঙ্গলের আশীর্বাদ নেই, যে হৃদয়ে দয়া, মমতা, ক্ষমা নেই - আমার প্রয়োজন নেই সে ভগবানের! শুধু আমারই নয়, সমগ্র জীব জগতেরই এমন পাষণ্ড ভগবানের কোনও প্রয়োজন নেই।

আত্রী একদিন এই প্রসঙ্গে দোহাই দিয়েছিলেন নিয়তির, কপালের লিখনের। কিন্তু নিয়তিকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা যদি ভগবানের না থাকে, তবে কী প্রয়োজন সে ভগবানের? আসলে সব ধাপ্পা। কিছু নেই, কিছু নেই। নেতি, নেতি নেতি।

কিন্তু তবুও তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নেতির পরেও মন চায় আরও কিছু। বার বার ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে সেই ভুদিনের ক্ষণ-স্থায়ী অনুভূতি। শেষ পর্যন্ত কখন যে ধীরে ধীরে পণ্ডিতজীর তাবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, জানি না।

অনেকদিন পর আমাকে দেখে পণ্ডিতজী খুশী হয়ে উঠলেন। এতদিনকার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনুযোগ করতে গিয়েই কিন্তু থমকে গেলেন তিনি। তারপর ব্যস্ত হয়ে বললেন, কি হয়েছে আপনার, বাবুজী? চোখ মুখ সব বসে গেছে। শরীর খারাপ না কি?

জোর করে একটু হেসে বললাম, না, শরীর ভালই, তবে ভয়ানক মানসিক অশান্তিতে ভুগছি।

—কেন, বাড়ী থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে না কি? পণ্ডিতজী আত্মীক স্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন।

—নাঃ, বাড়ীই নেই, তার আবার খবর। এবার কিন্তু চেষ্টা করেও হাসতে পারলাম না।

—তবে ?

বললাম, সেদিন নদীর ধারে আপনার সাথে যে আলোচনা হয়েছিল, তা মনে আছে আপনার ? আপনার বক্তব্য আমি মানি না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার। যন্ত্রণারও বিরাম নেই।

মৃদু হেসে পণ্ডিতজী আমায় বসালেন তাঁব চার পাই-এ। নিজে বসতে বসতে বললেন, বুঝেছি, আপনার অন্তর শুদ্ধ হচ্ছে। আপনার এতদিনের ভুল ধারণার মূলে ভাঙ্গন ধরেছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন আপনি। জন্মের শুভ মুহূর্ত তো যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই আসে বাবুজী। আপনার হচ্ছে নই জীন্দগী—যন্ত্রণা তো হবেই। একটু থেমে বললেন—

ইন্‌হী দিল্ ভঙ্গীয়োঁসে
আপ্ ভী বেজার বৈঠে হৈঁ।
হজারোঁ তুম্‌সে মেরে
তালিবে দীদার বৈঠে হৈঁ॥

তারপর আমাকে নিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সামনের পীরপাঞ্জালের দিকে নির্দেশ করে বললেন, ওদিকে চেয়ে দেখুন বাবুজী। কি দেখছেন ? কি অনুভব করছেন আপনার মনে ?

নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। একটা দুর্দান্ত আকর্ষণ, একটা অদ্ভুত ভয়, একটা অচিন্ত্যনীয় আকুতি আমাকে যেন ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলল। শিউরে উঠে বললাম, ওকে আমি ভয় করি পণ্ডিতজী। ওকে দেখলেই আমার অন্তর শিউরে ওঠে। আমি ঘৃণা করি ওকে কিন্তু তবুও না দেখে থাকতে পারি না।

মৃদু হেসে পণ্ডিতজী বললেন, আমরা পাহাড়ের লোক বাবুজী,

কিন্তু আমারও ওই রকম হত। আসলে যা বিরাট, যা মহান, তার সান্নিধ্যে আমাদের ভয় হবেই ; কারণ আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দের স্পর্শও পাই। এই তো তার গুণ, আর, এই তো হল মুহব্বতেরও গুণ। অন্তর যত শুদ্ধ হয়ে আসবে, ততই স্থির হয়ে আসবে তার সব চঞ্চলতা। তারপর এক সময় অসীম আনন্দ আর স্থৈর্যে ভরে উঠবে অন্তর।

অভিভূত অবস্থা থেকে হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলাম। কথাগুলো ভাল লাগছিল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে আমি অব্যাহতি পেতেই চাইছিলাম। কিন্তু এই প্রলোভন থেকে আমার জাগ্রত মন এক ধাক্কায় আমাকে কঠিন করে তুলল। বললাম, ওটা তো কোন যুক্তি হল না। হিমালয় বিরাট---একটা বস্তু গ্রাহ্য সত্তা, কিন্তু হিমালয় যে মহান এটা কী ভাবে স্বীকার করব। হিমালয় মহান বললেই মানতে হয় হিমালয়ের এক স্বতন্ত্র প্রাণ সত্তা আছে, এর কতগুলো মহৎ গুণ আছে যা একে মহান-এর মূল্যবোধে চিহ্নিত করেছে। এটা তো একেবারে অবাস্তব ব্যাপার। তবুও স্বীকার করলাম, তাকেও ভালবাসতে পারেন, যেমন আমি ভালবাসি নদী মাতৃক সমতল বাঙলা দেশকে। কিন্তু তাকে ভালবাসা আর রক্ত মাংসের মানুষকে ভালবাসা দুই-ই এক, একথাই বা স্বীকার করি কি করে?

সুদূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বৃদ্ধ বললেন, এ দুটো যে এক একথা আপনি মানতে পারছেন না এই জন্যে যে, আপনি ভালবাসার মধ্যে লাভ লোকসানের হিসাব করছেন। ভাবছেন হিমালয়কে ভালবাসলে, সে আপনাকে কি দেবে? আর তা ছাড়া এগুলো তো যুক্তির কথা নয় বাবুজী, এ হল বিশ্বাসের কথা— অনুভূতির কথা। কিন্তু তবুও যুক্তি আছে। রক্তমাংসের মানুষকে ভালবাসাই তো প্রেমের শেষ পরিণতি নয়। প্রেমের শেষ মঞ্জিল হ'ল সেই রক্তমাংসের ভিতরে যে হৃদয় আছে, যে দিল্ আছে, তাকে

স্পর্শ করা। সেই হৃদয়, সেই আত্মাই তো ভগবান। আর সেই ভগবানই তো বিরাট, মহান। হিমালয়ও তো সেই রক্ত-মাংসের পিণ্ডের মতো একটা দৃশ্যমান পাথরের স্তূপ। এবং আপনিই তো স্বীকার করলেন যে ওকে দেখলেই আপনার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়।—কেন?

ততক্ষণে আমি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিলাম। তর্কের সুরে বললাম, ও অনুভূতি তো ক্ষণিকের। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সবারই কখনও কখন হয়। এটাকে মনের একটা বিলাস বা ভ্রম যা ইচ্ছা বলতে পারেন। কিন্তু রক্তমাংসের মানুষকে ভালবাসার মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ আছে, তা তো পাথরের স্তূপের মধ্যে নেই। এর মানুষের জীবনের প্রাচীনতম, প্রচণ্ডতম এবং চিরন্তন অনুভূতিই হল যৌন অনুভূতি। সেই আকর্ষণকেই তো বাদ দেওয়া হয়, আপনার কথা মত দেহকে বাদ দিলে।

পণ্ডিতজী গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, আপনার কথায় দুঃখিত হলাম বাবুজী। আমি মূর্খ মানুষ, তাই তর্ক করব না। শুধু এই কথাই বলব যে, দেহটা হ'ল সিঁড়ি, ঘর নয়। দেহটা হ'ল দীপ, আলো নয়। দেহটা হল ফুল, কিন্তু গন্ধ নয়। আদতে দেখতে হবে আমরা কি চাই। সত্য-সন্ধানী কখনও আলোকে ছেড়ে দীপকে সত্য বলবে না, গন্ধকে ছেড়ে ফুলকেই সত্য বলবে না, সিঁড়িকে বলবে না ঘর।

মনের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। পণ্ডিতজীর কথাগুলো মোটেই সাধারণ লোকের মতো নয়। তাই সাবধানে বললাম, আপনাকে উপহাস করবার স্পর্ধা আমি রাখি না। কিন্তু সত্যিই বলুন তো, আপনার এই দেহ যদি না থাকত, তবে এই চিন্তাগুলো আপনি করতেন কী করে? এই পৃথিবী, এই মানুষ সব বাদ দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের চিন্তা করা কি সম্ভব হতো?

—আমি তো আপনাকে সেদিনও বলেছিলাম বাবুজী, যে

দেহকে এবং এই দৃশ্যমান জগতের কোন বস্তুকেই আমি উপেক্ষা করি না। আমি এদের মধ্যে সেই মঙ্গলময়ের স্পর্শ পাই। তাই এদের আমি ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসি এই জন্যেই যে, এদের আত্মাকে ভালবাসবার জন্য এদের উপেক্ষা করা অসম্ভব। দেহ নিয়ে আমি কি করব যদি তার মধ্যে প্রাণ না থাকে? আলোই যদি না থাকে তবে দীপ দিয়ে কি হবে?

ঘুরে ফিরে আবার সেই ধকজাল। বেশ বুঝতে পারলাম পণ্ডিতজীর সবল আন্তরিক কথাগুলো আমাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তাই বললাম, থাক এ সব কথা, চলুন গান শোনাবেন।

আবার মন্দিরের মধ্যে ফিরে গেলাম। সন্ধ্যারতি শেষ করে পণ্ডিতজী এসে পাশে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি গান শুনবেন?

বললাম, বাহার।

—বাহার? এই অসময়ে? পণ্ডিতজী একটু হেসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বললাম, হ্যাঁ পণ্ডিতজী। উচ্ছল প্রাণের স্পর্শ না পেলে আমি মরে যাব। তাই শৃঙ্গার রসের রাগই ভাল।

বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধ হারমোনিয়ম টেনে নিলেন।

গান মোটেই জমছিল না। পণ্ডিতজী বোধহয় বুঝতে পারলেন। একটু হেসে বললেন, আমার পছন্দমত একখানা শুনুন। দেখুন ভাল লাগে কি না। একটু থেমে আলাপ আরম্ভ করলেন।

মিটমিটে আলোয় মন্দিরের ভিতরটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। বাগেশ্রীর গম্ভীর সুর যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল সেই অখণ্ড রহস্য-সৈকতে। গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠে রাগ যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। গান জমবার লক্ষণ এগুলো। পূর্বেও বহুবার এরকম হয়েছে। ক্রমশঃ সেই সুরের ঢেউয়ে আমার খণ্ড সত্তা যেন ডুবে গিয়ে অখণ্ড সুর-

সমুদ্রের পানে ধেয়ে চলল। "কৌন্ করত তোরী বিনতী পিহরবা" —সুরের পর সুর বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি ছুটে চলল। তারপর একসময় সবিস্ময়ে অনুভব করলাম, সেই বিরাট, রহস্যময়, মহান অনুভূতি আমার অন্তরকে প্লাবিত করে, হৃদয়কে মথিত করে, আমাকে এক অনন্ত আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মনে হল, এতক্ষণের বিতর্ক, এতদিনের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমি যেন আত্ম-প্রবঞ্চনা করে এসেছি। এতদিন ধরে দৃঢ়ভাবে আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি, সে সব ভুল—সব মিথ্যা। অনন্ত সত্য হল আনন্দ। যে আনন্দ পীরপাঞ্জাল, আর আজ গানের মধ্য দিয়ে আমার অন্তর স্পর্শ করে গেল। আচ্ছন্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে মেসে ফিরলাম।

ক্রমে বরফের সমুদ্রও শেষ হল। সেদিনের পর পণ্ডিতজীর সাথে আর দেখা হয় নি। ইচ্ছা করেই দেখা করি নি। আত্রী সাহেবের চিঠি পেয়েছিলাম একখানা—তারও কোন উত্তর দিই নি। প্রকৃতপক্ষে আমি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

শীত শেষ হয়ে যাওয়াতে ভেঙ্কটস্বামী বড়ই ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। গরমের মধ্যে তাঁর রাম্ সহ্য হয় না। তাই শীতের বিদায় উপলক্ষ্যে তিনি সেদিন দিলেন এক পার্টি। নিমন্ত্রিতেরা সবাই যখন উপস্থিত, ভেঙ্কটস্বামী ওম্‌লেটের প্লেট্ সাজাতে সাজাতে বললেন, আমার বন্ধু—দিস্ ভার্জিন্ সোল্—আমার কাছে দিক্ষা নিয়েছে। নৌসেরায় যখন প্রথম দেখেছিলাম ওকে, তখন বেচারার চোখে ছিল দীপ্তি, মুখে ছিল লাশ্চার। আর আজ, ওর চোখ দুটো গেছে সকেটে ঢুকে, গাল গেছে চুপসে, আর দৃষ্টি হয়েছে ঈগলের মতো। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, বেচারা আজ সোল্‌জার হয়েছি বলে গর্ব করতে পারে। তারপর আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হেসে বললেন, আজ আমার চেলা আপনাদের কাছে

পাটিয়ালা পেগ্-এর নমুনা পেশ করবে। সকলে হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল।

আইয়ার ধরেছিলেন ঠিক, কিন্তু পরিবর্ত্তনের কারণটি তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি জানতেন না যে, গত একমাস ধরে আমার রজনী অতিবাহিত হয়েছে বিনিদ্রায় নানা চিন্তার দ্বন্দ্বে। ডাক্তার বলেছিলেন, ইনসম্‌নিয়া।

পৃথিবীতে যত রকমের পার্টি আছে, তার মধ্যে এ পার্টি জমে সবচেয়ে সহজে, আর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। কারণ, পার্টি আরম্ভ হবার সাথে সাথেই, প্রত্যেকেই হয়ে পড়ে হোস্ট। বলা বাহুল্য, ভেঙ্কটস্বামীর পাটিয়ালা পেগ্-এর মাহাত্ম্যে পার্টি মুহূর্তে জমে উঠল। তৃতীয় রাউণ্ডে ভেঙ্কটস্বামী হঠাৎ বললেন, মাই ডিয়ার ওল্ড বয়, ওই দুশ্‌মনের মতো ট্রেনার্ হাবিলদারটা তোমার নামে কি বলেছে জানো?

কথাটা শোনবার আগ্রহে সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল, আর আমার কাণদুটো হয়ে উঠল লাল।

আইয়ার গম্ভীর মুখে বললেন, ওর আর্দালীর কাছে বলেছে, সাহেবের হাত দুখানা তার জরুর হাতের চেয়েও নরম। ও হাতে বান্নাই হবে না, তার আবার সাড়ে সাত পাউণ্ডের রাইফেল ধরবেন।

হাসির ধাক্কায় পাহাড়ে পাহাড়ে যেন ভূমিকম্প সুরু হল।—জরু—মাই গ্যাড—হা-হা, হো-হো, হি-হি,—জরু। ক্যাপ্টেন মেনন্ হঠাৎ খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে দেখতে দেখতে বললেন, না, সে ভুল বলেছে। ওর জরুর হাত নিশ্চয় এরকম হাড়-সর্বস্ব নয়।

আবার এক ঝলক হাসির হিল্লোল উঠল।

—কিন্তু জেণ্টলমেন্, আমার ফ্রেণ্ড কাম্ চেলা ইজ এ ট্রু সোল্‌জার, তার ওপর কিছুদিন থেকে ওর মন খারাপ। থিঙ্ক

দেয়ারস্ সাম্‌থিঙ্ রঙ্। যাই হোক আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করব যে, ওর জুতোর কাঁটাটা ঠিক কোনখানে বিঁধছে।

সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—ইয়েস্ ইয়েস্।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। এইবার মওকা বুঝে গ্লাসের তলাটুকু এক চুমুকে শেষ করে বললাম, দেয়ারস্ নাথিঙ্ রোমান্টিক্। আমার দুঃখ শুধু এই জন্য যে, এ জায়গা ছেড়ে গেলে আইয়ার সাহেবের সঙ্গ হারাতে হবে। আসলে, আই এ্যাম্ ডেডলী ইন্ লভ উইথ মাই ডিয়ার আইয়ার।

—হেল্—আইয়ার মুখখানা লম্বা করে শ্রাগ করলেন। সকলে আবার চীৎকার করে উঠল।

মেনন অনেকক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্ করছিলেন। গাইয়ে লোক ক্যাপ্টেন। কিন্তু এ পার্টিতে কেউ কাউকে অনুরোধ করে না—নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই শেষ পর্যন্ত মেনন্ নিজেই প্রপোজ করলেন যে, তিনি গান গাইবেন।

আইয়ার চুপচাপ থাকবার লোক নয়। দেশোওয়ালী গান শুনে তার হৃদয়ও উধাও হয়ে গেল তার এনিফ্যাণ্টাইন্ প্রিয়ার কাছে, মালাবারের এক কোণে, নারকেল বীথির মধ্যে। বললেন, মালাবারের একটা লভ সঙ্ শোনো।

চোখের সামনে তখন সব একাকার দেখছি, কিন্তু তবুও বুঝলাম এ যদি লভ সঙ্ হয়, তবে তা বোঝবার মতো একটিমাত্র মানবী আছেন এ পৃথিবীতে—তিনি আইয়ার-পত্নী। পাঁচজনের সম্মিলিত কণ্ঠের বিভিন্ন ভাষার রাগ-রাগিনী শুনে আমার মনে হল যেন নরকের দরজা খুলে গেছে। তারপর কখন যে সে কোলাহল থেমে গেছে জানি না। গত এক মাসের মধ্যে, সেই একটি রাত আমার কাটলো গভীর নিদ্রায়—আইয়ারের তাঁবুতে, তাঁর টেবিলে মাথা রেখে।

আবার বসন্ত ফিরে এলো হিমালয়ের দ্বারে। আবার ফুলে-ফুলে গানে-গানে ভরে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। পীরপাঞ্জালের বরফগুলো গলে যখন তার সম্পূর্ণ কালো চেহারা ফুটে উঠল, তখন যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। বরফের যেন এক সম্মোহন শক্তি আছে। তাই তাকে আমি ভয় করি।

সেদিন অফিসে ডাকের চিঠিগুলো দেখতে দেখতে ভেঙ্কটস্বামী চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো ফ্রেন্ড নয়! আমাদের সুখের দিন শেষ হল। তোমাকে ওরা বদলী করেছে শ্রীনগর। লক হিয়্যার।

চিঠিখানা হাতে গুঁজে দিলেন আইয়ার। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম টাইপ করা কাগজখানার দিকে। শ্রীনগর আবার তিনশ মাইল পথ। আমার পরিশ্রান্ত দেহ ও মন যেন অবশ হয়ে এলো।

রাজৌরীর ইতিহাস শেষ হল। যাবার আগের দিন পণ্ডিতজীর কাছে গেলাম বিদায় নিতে। অনেক কথার পর বৃদ্ধ বললেন, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এলো। তোমার সামনের পথ এখনও অনেক দীর্ঘ। সামলে চলবে আর কি বলব। বৃদ্ধ এই প্রথম আমায় তুমি বলে কথা বললেন। তারপরই আনমনে গুন গুন করে উঠলেন --

হম্ ওহাঁ হায় জঁহা সে হমকো ভী।
কুছ হমারী খবর নহী আতী।
করতে হায় আরজু হম্ মরনে কী।
মৌত আতী হায় পর নহী আতী॥

মৃত্যুর আকুল প্রার্থনা করছি কিন্তু মৃত্যু এসেও আসছে না। পণ্ডিতজীর কণ্ঠে আজ বিদায়-দিনে মৃত্যুর আকাঙ্খা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

পণ্ডিতজী তোমায় নমস্কার। তোমার মত আমি না মানলেও

তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার জীবন ধন্য, কারণ—তার গতি হয়েছে ধ্রুব, আবেগ হয়েছে শান্ত। আর আমার অশান্ত মন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। গতির চাঞ্চল্যে আমি আজ ক্লান্ত।

চীনাবের তীর ধবে ধীরে ধীরে বানিহাল পৌঁছলাম। অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু দেখা গেল তাতে বুঝতে পারলাম পৃথিবী বদলে গেছে। নৌশেরা-পুঞ্চ অঞ্চলের সে তীব্র-রুক্ষতা আর আগ্নেয় শুষ্কতা কখন অন্তর্হিত হয়েছে। আমি এসে পড়েছি এক তীব্র সবুজের রাজ্যে, পপ্‌লালের বনের মধ্যে।

পরদিন ভোর পাঁচটা তিরিশ মিনিটে আমাদের কনভয় বানিহালের রেস্টক্যাম্প ছাড়লো। ছোট্ট বাজার পেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল বিরাট দেহ পর্বত। চূড়ার বরফে তার লেগেছে সোনার ছোঁয়াচ। ড্রাইভার গম্ভীরভাবে জানাল এই হল বিখ্যাত পীরপাঞ্জাল এবং এরই চূড়ায় বানিহাল পাস্।

চমকে উঠলাম। সেই পীরপাঞ্জাল—আমার দিবসের ভয় এবং রাত্রির দুঃস্বপ্ন। যাকে এড়াবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আজ সে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন ভ্রুকুটি করছে। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গাড়ী উঠছে পীবপাঞ্জালেব শরীরের উপর। বানিহাল শহর ক্রমশ ছোট হয়ে এলো, আর নীচের সব কিছুকে ঢেকে দিল দলে দলে ছন্নছাড়া মেঘ। আট হাজার ন'শ উননব্বই ফিট উঁচুতে বানিহাল পাস্ এর ওপারে দরজার মুখেই গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল! সামনের পথ বন্ধ।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমার সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে সব মেঘময়। মাঝে মাঝে সে অনন্ত মেঘ-সমুদ্রে আলোর বন্যা ছড়িয়ে তীব্র বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। পথের উপর পীরপাঞ্জাল

তার দেহ থেকে ফেলে দিয়েছে একটা পাথরের চাঁই। সেটা না সরান পর্যন্ত সমস্ত যান-বাহন চলাচল বন্ধ। এখানকার উচ্চতার জন্য নিঃশ্বাস নিতেও একটু একটু কষ্ট হতে লাগল।

গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। এই সেই পীরপাঞ্জাল। একেই আমি রাজৌরী আর পুঞ্চ থেকে দেখে, তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছি। এই পর্বতকে আমি ভয় করেছি যত, আকর্ষণ অনুভব করেছি ততখানিই। ঘৃণা করেছি যত, ভালবেসেছি তার চেয়ে কম নয়। আজ সেই পীরপাঞ্জালের বুকের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ীর হিংস্র উল্লাস অনুভব করলাম। গর্বে আমার মন ভরে উঠল। বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করছে ওই টানেল এবং এই পীচ-মোড়া পথ।

কি রকম একটা শব্দ হচ্ছিল থেকে থেকে। হঠাৎ সে শব্দটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। তারপর মুহূর্তের জন্য যেন পীরপাঞ্জাল তার বিরাট দেহটা নাড়া দিল। চমকে উঠলাম। ভয়ে বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফালাফি আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পূর্বের হিংস্র উল্লাস এবং বিজয়ের গর্ব পলকে অন্তর্হিত হল। পরাজিত, ভয়ার্তের মতো আমি কুঁকরে গেলাম। ড্রাইভার সহাস্যে বলল, ল্যাণ্ড্‌স্লাইড্‌ হচ্ছে। ও-তো এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে পথের পাশে দাঁড়ালাম নির্বাকভাবে। চারদিকের মেঘের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। একটা দমকা বাতাসে মুহূর্তের জন্য আমার সামনের মেঘগুলো একটু সরে গেল। নীচে বহুদূরে উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল বানিহালের বাজারটা। উপরে তাকিয়ে দেখলাম চূড়ার বরফগুলো যেন অনন্ত নীল আকাশের মধ্যে উধাও হতে চাইছে।

সামান্য একটুক্ষণ। আবার সব ঢেকে দিল জমাট মেঘ। গুম্‌গুম্‌ করে কোনদিকে যেন ল্যাণ্ড্‌স্লাইড্‌ হল আবার।

পাহাড়ের কোণে কোণে, মেঘের স্তরে স্তরে, সে শব্দ প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো--গুম্-গুম্-গুম্। হঠাৎ মনে হল যেন কথা বলে উঠল পীরপাঞ্জাল। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম মাথার উপর। জমাট মেঘের মধ্যে বরফের স্তূপ থেকে একটা অদ্ভুত নীল আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অকস্মাৎ যেন মোহভঙ্গ হল আমার। বিরাট, মহান পীরপাঞ্জাল কথা বলে উঠল। যে-কথা বজ্রনাদে উচ্চারিত হয়েছে পৃথিবীতে যুগে যুগে। আমার হৃদয়ে সে-কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল--"Love ye your enemies, and do good ...and your reward shall be great and ye shall be the children of the Highest....the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand, repent ye . who can forgive sins but God only."

"The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand", বজ্রনাদে কথাগুলো যেন চমক দিয়ে গেল আমার হৃদয়ে। পীরপাঞ্জাল পাথর আর বরফের জড় স্তূপ নয়। পীরপাঞ্জালের আত্মাকে আজ আমি নিজের আত্মা দিয়ে অনুভব করলাম। "Love ye your enemies....' হঠাৎ অনুভব করলাম, তমিস্রাকে আমি ভালবাসি। সে ভালবাসা বিনষ্ট হবার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বুঝতে পারলাম যে, সে ভালবাসার রূপ যেন বদলে গেছে। এই পীরপাঞ্জাল, এই হিমালয় যেমন সত্য এবং সুন্দর, বিরাট এবং মহান্, তেমনই সত্য ও সুন্দর, বিরাট ও মহান্ তমিস্রার অন্তর। সে হৃদয়কে, সে অন্তরতম মহানকে, আমি এবং তমিস্রা কেউই চিনি নি, অনুভব করি নি। আজ আমি অনুভব করলাম, কিন্তু তমিস্রা চিনল না। দুর্ভাগ্য তার।

তমিস্রার দুর্ভাগ্যের জন্য হৃদয়ে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। ওই গর্বিতা, শিক্ষিতা মহিলাটির মধ্যে আমার চির-পরিচিতা নির্বোধ, দুর্ভাগা মেয়েটিকে মুহূর্তে চিনে নিলাম নতুন

করে। তার রক্ত-মাংসের দেহের মধ্যে যে অব্যক্ত অন্তরতম বিশ্ব-শক্তি বিরাজ করছেন, তাঁকে এতদিন না জানলেও, না চিনলেও, আমার প্রেম তো তাঁরই জন্য। তাঁকে উপেক্ষা করে আমি আকর্ষিত হয়েছি ওর এই নারী দেহের প্রতি। তাতে সে যখন তিরস্কার করেছে, তখন আমি ওর দেহকে ঘৃণা করি নি. ঘৃণা করেছি সেই মহানকে, যাঁর উপলব্ধি এই মুহূর্তে আমার হৃদয়কে সূর্যালোকের মতো উদ্ভাসিত করে দিল। "Repent ye....who can forgive sins but God only"---আমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ভয় আমার মন থেকে সরে গেল। দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলাম সেই মহানকে। এই হিমালয়কে নিয়েই আমার মানসিক সত্তার প্রথম জন্ম হয়েছিল। এই হিমালয়কে দিয়েই আমি চিনলাম সেই অনন্ত প্রেমময়কে, তমিস্রার হৃদয়ে যাঁর উপস্থিতি এতদিন আমার চোখে পড়ে নি। আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

পণ্ডিতজীকে মনে পড়ল।

পণ্ডিতজী তোমায় নমস্কার। জীবনে যদি তুমি এমন কোন কাজ করে থাক, যার জন্য বেহস্ত্ তার আসন বিছিয়ে রেখেছে তোমার অপেক্ষায়, তবে তা' হল আমাকে নব-জন্ম দেওয়া।

যেন রূপং রসং গন্ধং, শব্দান্ স্পর্শাঞ্চ মৈথুনাং।
এতে নৈব বিজানাতি, কিমত্র পরিশিষ্যতে॥

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মৈথুন ইত্যাদি দিয়ে যাঁকে জানা যায় না, তাঁকে জানবার উপায় একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ ছাড়া এবং অনুভব ছাড়া আর কি হতে পারে? আমার মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা রইল না যে 'এতদ্ বৈ তত্'।

সেই বিরাটের স্পর্শে আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল। নির্বাক

হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পথের ধারে। হঠাৎ কানে গেল—রাস্তা সাফ্ হো গয়া সাব্। চলিয়ে।

চলিয়ে?—কোথায়?

কিন্তু আধুনিক বিশ্ব আমার মর্মবেদনা বুঝবে না। আমাকে যেতেই হবে।

ছোট একটা পাথরের স্তূপ পার হয়ে বাঁ-দিকে ঘুরতেই, আমার সামনে যেন এক নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল। ঘন-গাঢ় সবুজ বিরাট এক সমতল প্রান্তর, নরম কার্পেটের মতো বিছিয়ে আছে মাইলের পর মাইল। দু'ধারে তাব চলে গেছে পাথরেব দেওয়াল ----পীরপাঞ্জাল আর পাঙ্গী রেঞ্জ।

কেউ বলে দিল না এর পবিচয়; কিন্তু নিঃসন্দেহে বুঝলাম পীরপাঞ্জালের পায়েব তলায় বিছিয়ে আছে কাশ্মীর ভ্যালি—Kingdom of God. একটা অপ্রকাশ্য গভীর আবেশে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল। 'The Kingdom of God is at hand....!'

একটা বাঁক ঘুরে, পপলার অ্যাভিনিউ ধরে আমার কনভয় আবার ছুটে চলল।